অগাস্ট-অক্টোবর, ২০২৩

সমাজ সংস্কৃতি বিকাশের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

উন্নয়ন

সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট

উন্নয়ন

সমাজ সংস্কৃতি বিকাশের ত্রৈমাসিক মুখপত্র □ দ্বিতীয় সংকলন □ অগাস্ট-অক্টোবর, ২০২৩

প্রকাশক ঃ অংশুমান দাস
সম্পাদক ঃ ড: দীপংকর রায়

সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ

সবুজ সংঘ
৩০/৯ রাজডাঙা মেইন রোড (পূর্ব)
কলকাতা—৭০০১০৭
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন ঃ ৯১৩৩৪০৭২৩৫৭৭,
৯৮৩১০০১৬৫৫,
৯৮৩০৯৭২১৩৬
ই-মেইল: director@sabujsangha.org

মুদ্রণ :
সহযাত্রী
৮, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯
ফোন ঃ ৯৮৩১৭০৩৯৩৭

এই সংখ্যায়

প্রকাশকের নিবেদন □ সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট বাইরের প্রভাবে নষ্ট হয় □ অংশুমান দাস □ ২

সম্পাদকীয় □ সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট কেমন করে হয় □ ড: দীপংকর রায় □ ৫

প্রিয় সম্পাদক □ ১৪

উন্নয়নের পদ্ধতি প্রক্রিয়া নিয়েই প্রশ্ন □ দিব্যেন্দু সরকার □ ২২

সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট ডায়নামিক কনসেপ্ট, এর কোনো ফর্মূলা নেই □ কৃত্তিকা সিমলাই □ ৩৭

সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট – তত্ত্ব ও বাস্তবতা □ ডঃ বিদ্যুৎ মজুমদার □ ৪৫

গ্রামসেবা □ অংশুমান দাস □ ৪৯

সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট করতে সময় লাগে, ধৈর্য লাগে, কিন্তু সম্ভব □ অশোক ভট্টাচার্য □ ৬৩

আগেকার দিনের নেতাদের উপলব্ধির গভীরতা আজ নেই □ অরুনাভ দাস □ ৭৩

পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত প্রবন্ধগুলির বক্তব্য লেখকদের নিজস্ব ও ব্যক্তিগত

— সম্পাদক

পত্রিকা প্রকাশের খরচ : প্রতি কপি ৩০ টাকা। পাঠক দান হিসেবে এটা দিতে পারবেন

প্রকাশকের নিবেদন

সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট বাইরের প্রভাবে নষ্ট হয়

উন্নয়ন পত্রিকার এই সংখ্যার বিষয়বস্তু 'সুস্থায়ী উন্নয়ন' বা সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট। বিভিন্ন লেখক গবেষক বিদ্বান ব্যক্তিরা তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীতে বিষয়টি নিয়ে নানারকম আলোকপাত করেছেন এই পত্রিকায়। পত্রিকার প্রকাশক হিসেবে এবং সবুজ সংঘ নামে এই সিভিল সোসাইটি অর্গ্যানাইজেসনের পরিচালক হিসেবে আমার নিজের ধারণা হচ্ছে যে, সুস্থায়ী উন্নয়ন জিনিসটা প্রতিটি ব্যক্তির, প্রত্যেক পরিবারের, জনগোষ্ঠীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর উপরেই নির্ভর করে। এর কোন স্ট্যান্ডার্ড বা সমমানীকরণ হয় না। ইংলন্ড, ফ্রান্স বা আমেরিকার কোন পরিবার বা জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের মাপকাঠিতে ভারতের জনগণের উন্নয়নের মাপ হয় না। সব দেশের মানুষের চাহিদা, ভৌগলিক সুযোগ সুবিধা, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, খাদ্য বস্ত্র বাসস্থানের ধরণ, শিল্প, বিনোদন, স্বাস্থ্য পরিষেবার ধরণ একই রকম হতে পারে না।

ভারতের প্রাচীন আর্থ সামাজিক যে কাঠামো ছিল। সেখানে গ্রামগুলিতে সুস্থায়ী উন্নয়ন ব্যবস্থা বহাল ছিল। গ্রামগুলি স্বয়ং সম্পূর্ণ ছিল। নানারকমের পেশা ছিল। কামার, কুমোর, তাঁতি, কৃষক ইত্যাদি। জমির কোন মালিকানা ছিল না। জমি বিক্রি করাও যেতোনা। একজন কর আদায়কারি ছিলেন, তিনি কর নিতেন। সেটা টাকায় নয়, ফসলের একটা নির্দিষ্ট শতাংশ কর হিসেবে দেবার প্রথা ছিল। বিনোদন ছিল গ্রামীণ যাত্রা, তরজা, ভাদু, টুসু, কীর্তন। গ্রামের শিল্পীরাই তাতে অংশ গ্রহণ করতেন। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ইংরেজরা কর আদায়কারী ভূস্বামীদের জমির মালিক ঘোষণা করেন। জমিদারি প্রথার প্রবর্তন হয়। ১৭২৯ সালের ইংলন্ডের শিল্প বিপ্লবের পর যন্ত্রের দ্বারা উৎপাদন আর বাজারের জন্য উৎপাদন সুনিশ্চিত করা হল। ভারতেও ক্রমশ সেইসব ব্যবস্থা চালু হল। ভারতের গ্রামের সুস্থায়ী আর্থ সামজিক কাঠামো ভেঙে গেল। কলকারখানার উৎপাদনে গ্রামগুলি ভরে উঠলো। গ্রামের পেশাগুলির পরিবর্তন ঘটলো। ক্রমশ সামন্ততন্ত্র এলো। পুরোটাই বাইরের

প্রভাবে। এরপর ভারতেও শিল্পকারখানা স্থাপন হতে লাগলো। ওই জমিদার সামন্তরাই তাঁদের পুঁজি কলকারখানায় বিনিয়োগ করে শিল্পপতি হলেন। ধনতন্ত্র কায়েমের ব্যবস্থা পাকা হল। পাল্টে যেতে লাগলো ভারতের শিক্ষা স্বাস্থ্য বিনোদন খাদ্য বস্ত্র বাসস্থানের চিরাচরিত চাহিদাগুলি। এরপর মানুষের বেশভূষা সাজসজ্জা প্রসাধন দ্রব্য বদলাতে শুরু করলো বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন তার বিজ্ঞাপন প্রচারের নানাবিধ কৌশলে। শহুরে শিক্ষিতরা সেইসব কলকারখানার মালিক, বিজ্ঞাপন সংস্থার মালিকের চাকরে পরিণত হয়ে মালিকের বাণিজ্য এবং লাভ বাড়িয়ে তোলার যন্ত্র হয়ে উঠলেন। গ্রামকে গ্রাম শিক্ষিত মানুষ শূন্য হয়ে শহরে এসে তাঁরা ভোগ বিলাসে মগ্ন হলেন। গ্রামগুলির নিজস্ব বিনোদন ব্যবস্থাও সহর কেন্দ্রিক হল। গ্রামের চাহিদা, রুচি, মূল্যবোধ প্রচারের কৌশলে নিয়ন্ত্রণ হতে থাকলো শহরের তথাকথিত শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মূল্যবোধ, চাহিদা, লোভের দ্বারা। সবটাই বাইরের প্রভাবে দেখা যাবে গ্রামের সাসটেইনেবিলিটি নষ্ট করা হয়েছে। সুপরিকল্পিতভাবেই করা হয়েছে। ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ভোগবাদ। গ্রামীণ রীতিনীতি, সংস্কার, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক, পরিচ্ছদ, শিক্ষা সবই এক ছাঁচে ঢেলে শহরকেন্দ্রিক করার চেষ্টা চলেছে। ইতিহাস ঘাঁটলেই দেখা যাবে এমনকি ভারতের আদিবাসী সম্প্রদায়গুলিকে তাঁদের নিজস্ব সাসটেইনেবিলিটির কাঠামো থেকে বের করার জন্যে নানান সামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক আক্রমণ চালানো হয়েছে। এই যে সব বহিরাগত প্রভাব তৈরীর চেষ্টা এর সবটাই তথাকথিত আধুনিকতাবাদের নামে করা হয়েছে। প্রচলিত সাসটেইনেবেল ব্যবস্থাপনা ভেঙে দেওয়া হয়েছে, কৃষিক্ষেত্রেও, আর তার নিট ফল?

২০১৫ সালে বিশ্বের তাবড় বিশ্বনেতারা মোট সতেরোটি ক্ষেত্রের ১৪০ টি নির্দিষ্ট বিষয়ে উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা তৈরী করেছিলেন। ২০৩০ সালের মধ্যে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর কথা ছিল। তার নাম দেওয়া হয় 'সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট গোল।' এর মধ্যে ছিল বিশ্বকে ক্ষুধামুক্ত করা, অসাম্য কমিয়ে আনা, বিশ্বের প্রতিটি শিশুর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সুনিশ্চিত করা, লিঙ্গসাম্য প্রতিষ্ঠা, পৃথিবীবাসী যেন পরিষ্কার জল, উন্নত স্যানিটেশন, যথাসাধ্য সাশ্রয়ী প্রযুক্তি পরিষেবা, জলবায়ু পরিবর্তনে পদক্ষেপ করা।

সম্প্রতি রাষ্ট্রপুঞ্জের রিপোর্ট যেটি প্রকাশিত তাতে দেখা যাচ্ছে, ১৪০ টি লক্ষ্যের মধ্যে ১৫% আছে ঠিক পথে, ৩০% লক্ষ্যের অগ্রগতির চিহ্নমাত্র দেখা যায়নি। এই তিরিশভাগের মধ্যেই রয়েছে দারিদ্র, ক্ষুধা, জলবায়ুর মতন গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য সমূহ। এই মুহূর্তে পৃথিবী যেভাবে এগোচ্ছে ২০৩০ সালে সাতান্ন কোটির বেশী মানুষের জীবন চরম দারিদ্র্যে কাটবে। সাড়ে আট কোটি শিশু স্কুলের দরজায় পৌঁছাবে না। লিঙ্গসাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে আনুমানিক ২৮৬ বছর লাগবে। ইউনাইটেড নেশনস

ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের (ইউ এন ডিপি) ওই রিপোর্টে দেখছি কোভিড অতিমারি আর রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্বের ১৬.৫ কোটি মানুষকে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে পড়তে হয়েছে। এঁরা কাজ হারিয়েছিলেন। বিশ্বের ৭.৫ কোটি মানুষ দিনে গড়ে মাত্র ২.১৫ ডলারে দিনাতিপাত করেন। রাষ্ট্রপুঞ্জের মতে তাঁরা অতি দরিদ্র, ৯ কোটি মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে মানে ৩.৬৫ ডলার দৈনিক মাথাপিছু খরচ করতে পারেন (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৩০০ টাকা)। তার মানে ভারতীয়দের চারজনের সংসার হলে দৈনিক ১২০০ টাকা খরচ করেন যাঁরা, তাঁরাই দারিদ্রসীমার নীচে। অর্থাৎ বছরে চারজনের সংসারে ৪৩৮০০০, মানে মাসে ৩৬৫০০ টাকা খরচ করতে যাঁরা পারছেন না, তাঁরা দারিদ্রসীমার নীচে। ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে অবিলম্বে উন্নয়নশীল দেশগুলির ঘাড় থেকে বিপুল পরিমাণ ঋণের বোঝা না কমালে আরও বেশী মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে নেমে যাবেন। ৩০০.৩ কোটির বেশী মানুষ এখন এমন সব দেশে বসবাস করছেন যেসব দেশের সরকার স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতের তুলনায় ঋণ পরিশোধে বেশী অর্থ খরচ করে। অবিলম্বে ওই সব দেশের ঋণ পরিশোধ প্রক্রিয়া বন্ধ করতে আর্জি জানিয়েছে রাষ্ট্রপুঞ্জ।

পাঠক, তাহলে রাষ্ট্রপুঞ্জের মতে অতিদরিদ্র হচ্ছেন সেইসব পরিবার (চারজনের পরিবার) যারা প্রতিদিন মাত্র ৭০৮ টাকা খরচ করেন। মানে বছরে ২৫৮৪২০ মাসে ২১৫৩৫ টাকা হল অতিদরিদ্র, আর মাসে ৩৬৫০০ টাকা হচ্ছে দারিদ্রসীমার নীচে যারা। ভারতে আমরা তাহলে কোথায় আছি? আমরা কি ২০৩০ সালেও দারিদ্রসীমার নীচে পৌঁছাতে পারবো? এইসব বিষয়কেই আমি বলছিলাম এক্সটার্নাল ইনফ্লুয়েন্সে সাসটেইনেবিলিটি নষ্ট হওয়া। ভারতের গ্রামের যে পরিবার মাসে ৩৬৫০০ টাকা খরচ করেন, তিনি এতদিন জানতেন তিনি হচ্ছেন গোটা গ্রামের একজন ধনী ব্যক্তি, বড়লোক, হয়তো প্রভাবশালী বলেও চিহ্নিত। রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্ট পড়ে তিনি জানবেন যে তিনি আসলে দারিদ্রসীমার নীচে বাসবাসকারী। মাসে সাড়ে একুশ হাজার টাকা খরচ করে যিনি নিজেকে মধ্যবিত্ত ভাবতেন, আজ থেকে তিনি শিখবেন তিনি অতি দরিদ্র, মরা গরীব। একেই বলা হয় বাইরের প্রভাব। আগেকার মায়েরা বলতেন কুপ্রভাব লেগে মনটা 'কু' করে দেওয়া।

আমরা বলছি সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্টের কোন সমমান হয় না। স্ট্যান্ডার্ট ছক হয় না। ওটা একেক জনগোষ্ঠীর স্বপ্ন কল্পনা, চাহিদা, মূল্যবোধ, প্রাকৃতিক সম্পদ, ভৌগলিক অবস্থান, রুচিবোধ, শিক্ষা, সংস্কৃতি অনুসারে ওঠানামা করে। যুগে যুগে বদলায়, স্থানে স্থানে বদলায়,। বাইরের প্রভাবেই বদলায়। □

অংশুমান দাস
কলকাতা
১৮.০৭.২৩

সম্পাদকীয়

সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট কেমন করে হয়

এক.

'উন্নয়ন' পত্রিকার এই সংখ্যার বিষয় হচ্ছে সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট। অনেকে এই বিষয়টাকে শুধু অর্থনৈতিক দিক থেকে ভাবেন। সেই ধারণা যে সঠিক নয়, সেটা বোঝার জন্যে বর্তমান প্রবন্ধে আমেরিকার আর্থসামাজিক দিকগুলি নিয়ে শুরুতেই কিছুটা আলোচনা হওয়া দরকার।

গত ২৭শে এপ্রিল, ২০২৩ কলকাতা থেকে প্রকাশিত ইংরেজি দৈনিক সংবাদপত্র 'দি স্টেটসম্যান' শ্রীযুক্ত ভরত ডোগরা মশায়ের একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। এই ভরত ডোগরা ভদ্রলোক মোটেই একজন সাধারণ লোক নন। তিনি 'সেভ আর্থ নাও' ক্যামপেইনের অনারারি কনভেনর এবং আর্থ উইদাউট বর্ডার, ম্যান ওভার মেশিন প্রভৃতি বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের লেখক। তো ওই সাতাশে এপ্রিলের কাগজে শ্রী ডোগরা আমেরিকা নামে দেশটির আর্থিক সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু তথ্য দিয়েছেন তাঁর প্রবন্ধে। ভারতের বহু শিক্ষিত মানুষের কাছে আমেরিকা হচ্ছে স্বপ্নের দেশ, সে দেশে যাবার সুযোগ পাওয়া, থাকার সুযোগ পাওয়া নাকি খুব সৌভাগ্যের বিষয়। অনেকেই কল্পনা করেন, সেই দেশ হচ্ছে ধন দৌলত সম্পদে সমৃদ্ধ এক স্বপ্ন রাজ্য। তারা হচ্ছে দুনিয়ার সব থেকে ডেভেলপ কান্ট্রি, এসব কথা ছোটবেলা থেকেই শুনছি। অনেকেই ওই সমৃদ্ধ ধনী দেশটির, ডেভেলপ দেশটির নানা বিষয় অনুকরণের চেষ্টাও করেন। এখন দেখা যাক শ্রী ভরত ডোগরা কী তথ্য দিয়েছেন।

ফেডেরাল রিজার্ভ রিপোর্ট ২০১৮ অনুসারে, আমেরিকার পরিবারগুলির আর্থিক স্বচ্ছলতা সম্পর্কে শ্রীডোগরা জানিয়েছেন যে, আমেরিকার পরিণত বয়স্ক জনগণের শতকরা চল্লিশ ভাগ (৪০%) হঠাৎ কোনো জরুরী প্রয়োজনে খুব দ্রুত তাদের সঞ্চয় থেকে চারশো ডলার নগদে খরচ করতে পারবে না। এমনকি ক্রেডিটকার্ডেও পারবে না। চারশো ডলার হঠাৎ কোনো প্রয়োজনে খরচ করতে হলে শতকরা সাতাশ ভাগ মানুষকে হয় ঋণ করতে হবে অথবা ঘরের কোন কিছু বিক্রি করতে হবে। আর শতকরা বারো

(১২%) ভাগ আমেরিকান এই চারশো ডলার কোথাও থেকে যোগার করতেই পারবেন না। এই চারশো ডলার মানে ভারতীয় টাকায় মাত্র ৩৩০০০ হাজার টাকা মতন হবে। তারও কম। ভেবে দেখুন, ভারতের গরীব লোকের পক্ষেও কোন হঠাৎ জরুরী প্রয়োজনে বত্রিশ তেত্রিশ হাজার টাকা যোগার করাটাকি খুব কঠিন?

আরও শুনুন। আমেরিকায় বেসিক ইউটিলিটি বলতে বোঝায়— বিদ্যুৎ, গ্যাস, জল, অনাময়, ইন্টারনেট, টেলিভিসন, কেব্‌ল টিভি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ইত্যাদি। ডোগরা সাহেবের লেখায় আমেরিকার জনগণের এই বেসিক ইউটিলিটি সম্পর্কে জানা যাচ্ছে যে, আমেরিকার অনেক লোককে এখন বিল মেটাতে না পারার জন্যে ওই বেসিক ইউটিলিটির খরচ কাটছাঁট করতে হচ্ছে। এ সম্পর্কে আমেরিকার গার্ডিয়ান পত্রিকা ২০২০ সালের ২৩শে জুন জানিয়েছে, "জলের বিল ৮০% বেড়ে যাবার ফলে 'মিলিয়ন্‌স্ অফ আমেরিকান' (এক মিলিয়ন মানে দশ লক্ষ, আর 'মিলিয়ন্‌স্' মানে অনেকগুলো দশ লক্ষ) জলের বিল মেটাতে পারছে না।" ২০২০ সালের পয়লা অক্টোবর ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকা লিখেছেন, "মিলিয়ন্‌স্ অফ আমেরিকানদের না মেটানো বিদ্যুৎ এবং জলের বিল বেড়েই চলেছে। ১৭.৯ মিলিয়ন মানুষের জল এবং বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ হবার মুখে।" ২০১৬ সালের বয়স্ক মানুষের আর্থিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে যে, এইসব বয়স্ক প্রবীণ মানুষদের বেশীরভাগ তাঁদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারেন না। ভেবে দেখুন, এই ঘটনাটা কিন্তু কোভিড প্যানডেমিকের তিন বছর আগেই ঘটেছে।

এইতো গেল ওদের আর্থিক অবস্থা। এইবার আমেরিকার লোকেদের সামাজিক পরিস্থিতিটা কেমন দেখা যাক। শ্রী ডোগরা লিখেছেন ২৮% আমেরিকান গৃহগুলিতে একজন মানুষ একলা থাকেন। সমস্ত আমেরিকানদের শতকরা পঞ্চাশভাগ বিবাহে ডিভোর্স হয়ে যায় কিংবা সেপারেসন মানে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। তার মধ্যে নাকি ৪১% প্রথম বিবাহ, ৬০% দ্বিতীয় বিবাহ আর ৭৩% তৃতীয় বিবাহ রয়েছে! এইসব বিবাহ বিচ্ছেদের পরে আর্দ্ধেক মানুষ প্রবল দারিদ্রের কবলে পড়েন। তাঁদের শিশুদের অবস্থাও খুব খারাপ হয়ে যায়।

আমেরিকার ন্যাশনাল সেন্টার ফর ইনজুরি প্রিভেনসন এ্যান্ড কন্ট্রোলের একটি রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতি বছর আটচল্লিশ লক্ষ মানুষ তাঁদের অন্তরঙ্গ সঙ্গীর দ্বারা লাঞ্ছিত হয়ে থাকেন। প্রতি পাঁচজন নারীর মধ্যে একজন তাঁদের জীবনকালের কোনও না কোনো সময় ধর্ষিতা হয়েছেন। প্রতি তিনজন মহিলার মধ্যে একজন দৈহিক হিংসার শিকার হচ্ছেন এবং প্রতি দুজন নারীর মধ্যে একজন মানসিক হিংসার শিকার হচ্ছেন। প্রতি দশ সেকেন্ডে একটি 'চাইল্ড এ্যাবিউজ' ঘটে। এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন বছরে ৬৫৬০০০ এ্যাবিউজ তাঁরা ট্রেস করেছেন। বাস্তবে সংখ্যাটি আরও বেশী হবার সম্ভাবনা। কারণ আমেরিকায় বছরে চল্লিশ লক্ষ শিশুকে চাইল্ড প্রোটেকসন এজেন্সীর কাছে রেফার করা হয়। দুনিয়ার মধ্যে আমেরিকাতেই নাকি জেলে কয়েদ হবার ঘটনা সব থেকে বেশী।

প্রতি বছর নাকি আমেরিকার ১ কোটি মানুষকে জেলে ঢুকতে হয়। পৃথিবীর জনসংখ্যার পাঁচ ভাগের বেশী হচ্ছেন আমেরিকান। আর তার চারভাগের একভাগ নাকি জেলবন্দী কয়েদী। সেই কয়েদীদের মধ্যে অর্দ্ধেক আবার মানসিক রোগে ভুগছেন। অফিসিয়াল হিসাবে বছরে বারো লক্ষ ভায়োলেন্ট ক্রাইম ঘটছে। কিন্তু সব ক্রাইম পুলিস অব্দি পৌঁছায় না এটা আমরা সবাই জানি। তাই বাস্তবে সংখ্যাটা বারো লাখের অনেক বেশী।

আমেরিকার সেন্টার ফর ডিজিজ্ কন্ট্রোল এ্যান্ড প্রিভেনসন-এর ডেটাবেস জানাচ্ছে, সে দেশের মোট জনসংখ্যার অর্দ্ধেকের বেশী মানসিকভাবে অসুস্থ হিসাবেই চিহ্নিত হবেন। যে কোন বছরের পরীক্ষার ফলে দেখা যাচ্ছে শতকরা কুড়িভাগ লোকের মানসিক সমস্যা রয়েছে। প্রতি পাঁচটি শিশুর মধ্যে একজনের হয় বর্তমানে অথবা জীবনের কোনও না কোনো সময় সিরিয়াস মানসিক অসুস্থতার কথা পাওয়া যায়। করোনার বছরে ২০২১ সালে এক কোটি একচল্লিশ লক্ষ (১৪.১ মিলিয়ন) ১৮ বছরের বেশী বয়সী আমেরিকানের সিরিয়াস মানসিক রোগ দেখা দিয়েছিল। ৮৯.৫% বয়ঃসন্ধির মানসিক অসুস্থতাও চিহ্নিত হয়েছিল। ইয়ুথ রিস্ক বিহেভিয়ার সার্ভে থেকে জানা যাচ্ছে, সেদেশে ৪২% হাইস্কুল ছাত্রছাত্রী দুঃখ এবং আশাহীনতায় ভুগছে। এই সংখ্যাটা ২০১১ সালে ছিল ২৮%। ২০২১ সালে হাইস্কুলের ৫৭% ছাত্রীর এই সমস্যা হয়। হাইস্কুলের ২২% আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন ছাত্রছাত্রী মিলিয়ে। ছাত্রীদের মধ্যে ৩০% আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন।

এখন এই যে আমেরিকার আর্থিক সামাজিক চিত্র, এ থেকে কি মনে হচ্ছে যে সে দেশের ডেভেলপমেন্ট সাসটেইনেবেল হয়েছে? আমার মতে হয়নি, হওয়া সম্ভব নয় বলেই হয়নি। কারণ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অল্প কিছু লোকের হাতেই থাকে দেশের প্রায় সমস্ত সম্পদ। বাকীরা ওইরকম জল আর বিদ্যুতের বিল মেটাতে পারে না, বৃদ্ধেরা মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারে না। শিশুরা মস্তিষ্ক বিকৃতিতে ভোগে, আর যুবক যুবতীদের নানারকম মানসিক অস্থিরতার কারণে মরিচিকার পেছনে ছুটে ছুটে ডিভোর্স করে করে জীবন কেটে যায়। তাদের ডেভেলপমেন্ট দূর অস্ত। ব্যক্তিগত জীবনটাই সুস্থায়ী হয় না।

দুই.

যাঁরা ঠান্ডা এসি ঘরে বসে ভারতের গ্রামের গরীব মানুষদের পরিবার পিছু কয়েক হাজার টাকার হাঁস মুরগী ছাগল বিতরণ করে কয়েকটা স্কিল ডেভেলমেন্ট ট্রেনিং দিয়ে ভাবতে থাকেন সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট ঘটাবেন, আমার এই প্রবন্ধটি বিশেষ করে দেশের সেইসব পরিকল্পনাবিদ্দের উপলব্ধির জন্যে কাজে লাগতে পারে।

এবার আসি ভারতের কথায়। মনে রাখতে হবে যে, সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট নিয়ে চিন্তা করার সময় ভারতের বিশেষ কয়েকটি প্রাকৃতিক দিক নিয়ে না ভাবলে চলবেই না। সেগুলি হচ্ছে :

১। ভারতের ৪০ মিলিয়ন হেক্টর জমি বন্যাপ্রবণ।

২। ৫৯% জমি ভূমিকম্প প্রবণ।

৩। ৮% সাইক্লোন প্রবণ।

৪। ৬৯% জমি খরা প্রবণ।

ভারতে প্রতি বছর ৩০ মিলিয়ন মানুষ কোনও বা কোন ডিজাস্টারের কবলে পড়ে। সেই ডিজাস্টারের মধ্যে করমন্ডল এক্সপ্রেস ট্রেনের দুর্ঘটনার মতন বিষয়গুলি নেই। ওই ৩০ মিলিয়নের মধ্যে করোনাকেও ধরা হয়নি। শুধু দুর্যোগ ধরা হয়েছে। কারণ হিসেবটাই করা হয়েছে করোনা যুগ শুরু হবার আগে। যাইহোক ডিজাসটার বিষয়টাকে গুরুত্ব না দিয়ে শুধু সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট ভাবলে যেটা ঘটবে তা হল, তিরিশ বছরের ডেভেলপমেন্ট তিন মিনিটে ধবংস হয়ে যেতে পারে।

তাই প্রথমে ডিজাসটার কতরকমের হতে পারে সেটা বুঝে নেওয়া যাক

প্রথম হচ্ছে, জিও ফিজিক্যাল (Geo Physical) : ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরি, অগ্নুৎপাত, ধবস, সুনামি, তুষারপাত

দ্বিতীয়, মেটেওরোলজিক্যাল (Meteorological) : বন্যা, ঝড়

তৃতীয়, ক্লাইমেটিক ইভেন্ট (Climatic Events) : খরা, প্রচন্ড তাপপ্রবাহ, দাবানল, সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি, ঘন ঘন ঘূর্নিঝড়

চতুর্থ, বায়োলজিক্যাল (Biological) : মহামারী, সংক্রমণ

পঞ্চম, মনুষ্য সৃষ্ট (Man made) : দাঙ্গা, যুদ্ধ, আগুন লাগানো ইত্যাদি।

এবারে সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট মানে সুস্থায়ী বিকাশ উপরের বর্ণিত পরিস্থিতিগুলি মনে রেখেই ভাবতে হবে। আমাদের দেশের মতন দেশগুলিতে সব ভালো ভালো এ্যাম্বুলেন্স, চিকিৎসক, হাসপাতাল সবই প্রায় বড়লোকদের হাতে। তারপরেও শুধুমাত্র কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে ডেভেলপমেন্টকে সুস্থায়ী করার চিন্তা করতে পারতে হয়। সেগুলি হচ্ছে :

১। আগে থেকে সতর্কবার্তা --- কিন্তু দুর্যোগ প্রাকৃতিক হলে তার সতর্কবার্তা পাওয়া যতটা সহজ, দুর্যোগ মানুষের তৈরী হলে সেই সতর্কবার্তা পাওয়া ততো সহজ নয়।

২। দুর্যোগের ঝুঁকি কমানো --- যাকে ডিজাসটার রিস্ক রিডাকসন বলা হয়। এই ঝুঁকিটা শারিরিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত সবদিক দিয়ে কমাতে হবে। প্রাকৃতিক বা মানুষের তৈরী যেরকম দুর্যোগ হোক, তার প্রভাব কমাতে হয়। ব্যক্তি, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান সমূহের এ বিষয়ে দক্ষতা বাড়াতে হয়।

৩। দুর্যোগ মোকবেলার প্রস্তুতি --- এই প্রস্তুতির মধ্যে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের যোগান বজায় রাখতে হয়। সেগুলি হচ্ছে, তিরপল, পানীয় জল, জরুরী কালীন খাবার দাবার, জল পরিশুদ্ধ করার ট্যাবলেট, আশ্রয় পাবার ব্যবস্থা, রান্নার বাসনপত্র, কম্বল, ঘরোয়া কিট।

৪। রিকভারি --- এবার পুনরুদ্ধার নিয়ে ভাবতে হয়। এর মধ্যে রয়েছে, আশ্রয়, জল এবং শৌচব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, খাদ্য, শিশুর নিরাপত্তা, শিশুদের শিক্ষা। মানবিক নিরাপত্তা।

তাহলে বোঝাই যাচ্ছে যে, সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্টের প্রকল্প চালাতে গিয়ে কোন কোন দিক ভাবতে হবে। আরও আছে। কারণ আগেই বলেছি, এটা শুধু আয় রোজগার বাড়ানো, জৈব সার দিয়ে চাষ, ঘরবাড়ি, পাণীয় জল ইত্যাদির বিষয় নয়। তার থেকে অনেক বেশী, অনেক বৃহৎ।

তিন.

ভেবে দেখুন ইউরোপ মহাদেশের কথা। সোভিয়েত শাসনভুক্ত ছিল যে দেশগুলি, তাদের বাদ দিলে গোটা ইউরোপের সাইজটা প্রায় ভারতের মতই। ইউরোপের দেশগুলির জনগণের ধর্ম, জাতি, গায়ের রং, ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, পোষাক পরিচ্ছদ সবই প্রায় একরকম। বিভিন্ন দেশের মধ্যে এইসব বিষয়ে অমিল নেই বললেই চলে। অথচ তারা একসঙ্গে থাকতে না পেরে আলাদা আলাদা জাতিসত্ত্বা নিয়ে পৃথক পৃথক দেশ। ছোট ছোট পুঁচকে সব দেশ, কয়েক ঘন্টা মোটর সাইকেল চালিয়ে এক দেশ থেকে অন্য দেশে চলে যাওয়া যায়। তবু তারা পৃথক পৃথক দেশ। পৃথক তাদের সৈন্যবাহিনী, অস্ত্রভান্ডার, আর তারজন্যে বিশাল খরচও হয়। তারা ভাবতেই পারে না ভারত ১.৪ বিলিয়ন মানে ১৪০ কোটি জনসংখ্যার দেশ। যেখানে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি সব গুরুত্বপূর্ণ ধর্মের মানুষ আছেন, ২৩টা জাতীয় ভাষা সহ ১২১টা গুরুত্বপূর্ণ ভাষা সহ ১৫৯৯ অন্যান্য ভাষা। ১৯৫০ টা মাতৃভাষা, ২৮টা ফেডেরাল স্টেট। ৮টা কেন্দ্র শাসিত রাজ্য, ৩০০০ রকমের কাস্ট আর ২৫০০০ সাবকাস্ট নিয়ে এই উপমহাদেশ একটাই ভারতীয় জাতিসত্ত্বা হিসেবে একটাই সংবিধানের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এই জনগণের রাজ্যে রাজ্যে ভাষাগত মিল নেই। খাদ্যাভাস আলাদা, পোষাক পরিচ্ছদ আলাদা। তবু তেন্ডুলকর, বিদ্যাবালান, মেরিকম, সুন্দরলাল বহুগুণা, আর রবীন্দ্রনাথ একই দেশের নাগরিক। এরা সবাই ভারতীয়। বিভিন্ন রাজ্যের মানুষগুলির ইউরোপের দেশগুলির লোকের মতই পৃথক জাতিসত্ত্বা আছে। তামিল, পাঞ্জাবী, মারাঠি, গুজরাটি, বাঙালী, নাগা, মণিপুরি, মালয়ালি, কিংবা ওড়িয়া এরকম অজস্র পৃথক জাতিসত্ত্বায় বিভক্ত আমরাও। তবু আমরা ভারতীয়

হিসেবে এক। সেখানে ডঃ কালাম, দ্রৌপদীমুর্মু, তেন্ডুলকর আর হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়া, বিসমিল্লা খান, অমিতাভ বচ্চন সবাই আমাদের নিজেদের লোক। ভেবে দেখুন, এই ভীষণ আশ্চর্য ঘটনাটা কি সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্টের বাইরে? নাকি এইটাই সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্টের আসল অন্তর্নিহিত শক্তি ? এই শক্তিটা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নেই। ভারতের আছে। সেই শক্তির দ্বারাই এতবার বৈদেশিক আক্রমন, বৈদেশিক শাসনের পরেও ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতি সুস্থায়ী বা সাসটেইনেবেল হয়ে রয়েছে হাজার হাজার বছর ধরে।

বিষয়টা ভালো করে বোঝা যাক। পৃথিবীতে প্রাচীন সভ্যতা সংস্কৃতিগুলির নাম বলতে বললে সকলেই বলবেন, মিশরীয় সভ্যতা, গ্রীক সভ্যতা, মায়া সভ্যতা, চৈনিক সভ্যতা ইত্যাদি, সংস্কৃতিগুলির দিকে তাকিয়ে দেখুন। তারা সকলেই তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য খুইয়ে প্রথমে ইউরোপীয় শিল্প সভ্যতা, তারও পরে আমেরিকান অসভ্যতাগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একদম পাশ্চাত্যেরই খন্ড খন্ড অংশ হয়ে উঠেছে। ভারতে সেটা হয়নি। কর্নাটকের প্রত্যন্ত গ্রামে আজও সেই প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতি এবং ধর্মাচারণ চালু রয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশের কিছু গ্রামে আজও সংস্কৃত ভাষায় কথাবার্তা বলেন। ইন্দোএরিয়ান জনগোষ্ঠী রয়ে গিয়েছেন অন্ধ্র, কর্নাটক, কেরালা, শ্রীলঙ্কায় কিছু অংশে। বাকি ভারতবর্ষ যে যখন এসেছে বাইরের সেইসব মানুষ, তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, খাদ্যাভাস, রীতিনীতি, বিশ্বাস কোন কিছুই ফেলে দেয়নি। বরং এমনভাবে গ্রহণ করে নিজের মধ্যে বিলীন করে নিয়ে নিজেই পুষ্ট হয়েছে যে ভারতীয় সংস্কৃতি আজও সেই প্রাচীন সভ্যতা সংস্কৃতিগুলির মধ্যে একমাত্র, যা তার প্রাচীনতা নিয়েই টিকে রয়েছে। এটা হচ্ছে গ্রহণ করার শক্তি। ভীতুরা দুর্বলরা বাইরের জিনিসকে ভয় পায়, তাকে বর্জন করে নিজের বৈশিষ্ট্যগুলিতে সে আটকে থাকতে থাকতে একসময় ভিতর থেকে দুর্বল হয়ে ধবংস হয়। পুরোটাই তখন গ্রাস করে সেই বাইরের শক্তি। যেভাবে বদলে গেছে বাকী প্রাচীন সভ্যতা সংস্কৃতি। ভারতীয়রা তার প্রাচীন বিশিষ্টতাকে বজায় রেখেই বাইরের জিনিসকেও গ্রহণ করে স্ফীত হয়েছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সারাদিনে রাতে ভারতীয়রা আজও যা যা রীতিনীতি, পূজা, অর্চনা, পার্বন, খাদ্যগ্রহণ বা উপবাস, ব্রত ইত্যাদি যা কিছু করছে, সবই সেই মনুসংহিতারও আগের যুগ থেকে চলছে। পরিবর্তন ঘটেছে টেকনোলজিতে। আকবর বাদশা, শাজাহানের থেকেও একজন মধ্যবিত্ত ভারতীয় আজ আরামে থাকেন বিদ্যুতের আলো, মোটর গাড়ি, এয়ার কন্ডিসনার, ফ্রীজ প্রভৃতির দৌলতে। হালের মোবাইল ফোন চ্যাটজিপিটি ইত্যাদি সব উন্নত টেকনোলজি আমরা গ্রহণ করছি। ভোগ করছি। কিন্তু বিয়ের সময় অগ্নিসাক্ষী করে যদিদং হৃদয়ং মম টমো বলতে গর্ব বোধ করি। বিয়ের পর হাতের লোহার চুরিটা বর্জন করতে ভয় পাই। অর্থাৎ মনোজগতে যা ঢুকে রয়েছে তা সাসটেইনেবেল। অশিক্ষা কুশিক্ষা হলেও সাসটেইনেবেল। স্থির বিশ্বাস করি, ওই শাঁখা, লোহার চুড়িতেই স্বামী নামক পালোয়ানের জীবন রক্ষা হচ্ছে। একবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল

তথাকথিত আধুনিকা ছাত্রী, তাঁরা জিন্স পরিহিতা, ছোট চুল সমন্বিতা বঙ্গললনা, আমাকে জানালেন বিবাহিত পুরুষকে শরীরে বিবাহের কোন চিহ্ন ধারণ করতে হয় না। মেয়েদের কেন সিঁদুর পরতে হয়। এর বিরুদ্ধে তাঁরা আন্দোলন করবেন। আমি বললাম, বিরুদ্ধে আন্দোলন করে সিঁদুর পরা বন্ধ করা যাবে না। বরং সিঁদুরকে বেশী করে গ্রহণ করে অবিবাহিতারাও সিঁদুর পরতে শুরু করো। দেখবে সিঁদুরের ধর্মীয় গুরুত্ব শেষ হয়ে সেটি লিপস্টিক নেলপালিসের স্তরে চলে যাবে। প্রসাধনী হিসেবেই টিকে থাকবে। বর্জন না করে গ্রহণ করে করেই ভারতীয় সংস্কৃতি টিকে আছে। বলাই বাহুল্য তাঁরা এই প্রস্তাব মানতে পারেননি, কারণ কুমারী মেয়ে সিঁদুর পরবে তা আবার হয় নাকি?

অর্থাৎ ভারতীয় সংস্কৃতির শক্তি এতটাই যে, সে আপনার মস্তিষ্ক হৃদয় সব দখল করে বসে আছে। হাজার হাজার বছর ধরে আপনার রক্তে, জিনের মধ্যে, ডিএনএর মধ্যে। কোন পশ্চিমী শক্তিই একে বদলাতে পারেনি। কেননা সংস্কৃতি কোন তাৎক্ষণিক ক্রেজ নয়, সংস্কৃতি হচ্ছে টেস্টেড বাই টাইম এবং ট্রাস্টেড বাই জেনারেসন্স। মানে মহাকালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ আর প্রজন্ম প্রজন্ম ধরেই তার উপর আস্থা রাখা হয়েছে। তবে সেটা সংস্কৃতি হয়েছে। তবে সেটা সাসটেইনেবেল হয়েছে। ভেবে দেখুন সিঁদুর পরার রীতি ছিল না প্রাচীন ভারতে। আলেকজান্ডারের সৈন্যেরা ভারতীয় নারীদের বিবাহ করতে লাগলো, তখন সিন্ধু নদীর ধারের লালমাটি সিঁথিতে লাগিয়ে চিহ্ন দেবার প্রচলন করতে হয় এটা বোঝানোর জন্যে যে, এই নারী বিবাহিতা। তাই সেই লালমাটিকে 'সিন্ধুর' বলা হত। মাটি বলেই তাকে মেটে সিঁদুর বলা হত। পরবর্তী হাজার হাজার বছর ভারতীয় নারী নিজের নিরাপত্তার কারণেই ওই চিহ্ন ধারণ করেন। একে বলে টেস্টেড বাই টাইম ট্রাস্টেড বাই জেনারেসন্স। কতরকম খাবার এলো। ইডলি, মোগলাই, চাউমিন, মোমো, পিৎজা ইত্যাদি। বাঙালী ভাত খাওয়া ছাড়তে পেরেছে? ভাত, মুড়ি, পায়েস, বিরিয়ানি? একে বলে টেস্টেড বাই টাইম ট্রাস্টেড বাই জেনারেসন্স। সুতরাং ভারতীয় সংস্কৃতি যেভাবে সাসটেইনেবেল হয়ে রয়েছে, সেটাই সাসটেইনেবিলিটির পদ্ধতি। হাজার হাজার বছরের টেকসই একটা সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা। তার অশিক্ষা, কুসংস্কার, সৌন্দর্য সবকিছু নিয়েই সে টেকসই। তার অগ্নিসাক্ষি, সাতপাক ঘোরা, দক্ষিনের লুঙ্গি, পশ্চিমের বড়াপাউ, প্রবীনের সঙ্গে তর্ক না করে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম, নারীকে মাতৃজ্ঞান করা, উপোস করে মরলেও চুরি করতে না পারা এসব ছিল, থাকবেও। এর বিপরীত বিষয়গুলি ক্রেজ্, টেকসই নয়। স্মার্ট হবার, আধুনিক হবার তাৎক্ষণিক এবং বিচ্ছিন্ন অপচেষ্টা। ভারতের এই সাংস্কৃতিক শক্তিই মানুষের আর্থিক চাহিদা কমিয়ে ভোগবাদকে আটকে রেখেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগকে সহ্য করতেও শিখিয়েছে। মৃত্যুশোক ভুলতে শিখিয়েছে মুখাগ্নি, মৃতদেহ আগুনে দাহ করা, আবার নিয়মভঙ্গের দিন মাছ ভাত খেয়ে জীবনে ফেরত আসতেও শিখিয়েছে। হাজার হাজার বছরের এই সাংস্কৃতিক সাসটেইনেবিলিটি থেকেই সাসটেইনেবিলিটি কেমন করে হয়,সেটা শিখতে হবে।

চার.

২০১৫ সালের বৈঠকে জাতিসংঘ সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্টের সতেরোটা লক্ষ্য স্থির করেছে। সেগুলো হচ্ছে---

১। দারিদ্র নয়	No Povety
২। ক্ষুধা শূন্য	Zero hunger
৩। ভাল স্বাস্থ্য এবং মঙ্গল বা ভাল থাকা	Good Heath and well being
৪। মানসম্পন্ন শিক্ষা	Guality education
৫। লিঙ্গ সমতা	Gender equality
৬। পরিস্কার জল এবং অনাময়ব্যবস্থা	Clean water and sanitation
৭। সাশ্রয়ী মূল্যের পরিচ্ছন্ন শক্তি	Affordable and clean energy
৮। শালীন কাজ এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধি	Decent work and economic growth
৯। শিল্প, উদ্ভাবন এবং অবকাঠামো	Industry, Innovation and infrastructure
১০। অসমতা হ্রাস	Reduced inequalities
১১। টেকসই সহর এবং সম্প্রদায়	Sustainable Cities and Communities
১২। দায়িত্বপূর্ণ উৎপাদন এবং ভোগ	Responsible production and consumption
১৩। জলবায়ু সংক্রান্ত কাজ	Climate action
১৪। জলের নীচের জীবন	Life below water
১৫। জমিতে জীবন	Life on land
১৬। শান্তি, ন্যায়বিচার এবং শক্তিশালি প্রতিষ্ঠান	Peace, justice and strong institutions
১৭। লক্ষ্যের জন্য অংশীদারিত্ব	Partnership for the goals

এইগুলি বিভিন্ন দেশের সরকারের কাছে সেইসব দেশের জনগণের ডেভেলপমেন্ট ঘটানোর একটা গাইড লাইন। বা যাকে বলে রোড ম্যাপ। এই লক্ষ্যগুলির সঙ্গে ১৬৯টা টার্গেট দেওয়া হয়েছে। এইসব গোল টার্গেট বানাবার জন্যে তাঁরা কোটি কেটি টাকা খরচ করে অনেক দিনধরে পৃথিবীর সমস্ত সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের নিয়ে বিস্তর মিটিং করেছেন। ২০৩০ সালের মধ্যে এইসব কাজ করতে হবে জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলিকে। এর আগে ২০০০ সালে তাঁরা মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল বানিয়েছিলেন। কিছু কাজ নিশ্চই হয়েছে, হচ্ছেও। সবুজ সংঘ এবং এরকম বড় বড়

সংঘগুলি এই গোল ধরে ধরে প্রকল্প তৈরী করে জাতিসংঘের গোল বাস্তবায়ন করছে। সরকারীভাবেও অনেক চেষ্টা চলেছে। যদিও ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের সদ্যপ্রকাশিত রিপোর্ট 'আ ওয়ার্ল্ড অব ডেট ঃ আ গ্রোয়িং বার্ডন টু গ্লোবাল প্রসপারিটি' থেকে বোঝা যাচ্ছে, দুনিয়ার কমপক্ষে তিনশোকোটি মানুষ ভালো নেই তাদের অবস্থা খুব খারাপ, ঋণে ডুবে আছে তাদের দেশ।

বছর ৩৫ আগে, আমার তখন খুব কম বয়স, সবেমাত্র সাংবাদিকতার পেশা ছেড়ে সমাজসেবীদের প্রতিষ্ঠানে ঘুর ঘুর করছি, একদিন দেখা হয়ে গেল এইসব লাইনের সে যুগের দিকপাল বাঙালী-জার্মান নাগরিক ডঃ বাদল সেনগুপ্তের সাথে। তিনি তখন তাঁর সামনে উপবিষ্ট কয়েকজন সমাজসেবী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট বোঝাচ্ছিলেন। আমি ভীষণ বোকার মতন অথচ সহজ সরলভাবে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বিশ্বব্রহ্মান্ডে কোন কিছুইতো সাসটেইনেবেল নয়, সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র কেউই সাসটেইনেবেল নয়। সবই ধবংস হবে। তাহলে এই 'ডেভেলপমেন্ট' জিনিসটা কীভাবে সাসটেইনেবেল হবে? তিনি আমার এই শিশুর মতন সরল প্রশ্নটিকে কিন্তু গুরুত্ব দিয়ে কয়েক সেকেন্ড ভেবে নিয়ে হেসে বললেন, ওকে, ওকে, আমরা এখন থেকে বলব এ্যাপারেন্টলি সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট। মানে 'আপাত সুস্থায়ী বিকাশ।' বুঝেছিলাম যে তেরোশো বছর আগে শংকরাচার্য যে বলেছিলেন, "মা কুরু ধনজন যৌবন গর্বম/হরতি নিমেষাৎ কালৌসর্বম/ নলিনী দলগত জলমতি তরলম/তদ্‌বাজীবিতম্‌ অতিশয় চপলম্‌' --- মানে হচ্ছে ধন জন যৌবনের গর্ব কোরোনা, মহাকাল নিমেষে ওইসব গর্বের বস্তু হরণ করে নিতে পারে। পদ্মপাতায় জলের মত জীবিত মানুষের জীবন টলোমলো করছে... ---কিন্তু তারপরেও সাসটেইনেবিলিটির আশাটুকু জাগিয়ে রাখতেই হবে, সেটা এ্যাপারেন্ট জেনেও আশা ছাড়তে নেই। কারণ দেশের সবলোকতো সাধু সন্ন্যাসী ফকির হয়ে পাহড়ে ধ্যান করতে যেতে পারছি না। সংসারে থাকতে হলে পরবর্তী দিনগুলো যাতে আরেকটু ভাল স্থায়ীভাবে বাঁচা যায়, সে চেষ্টা করতেই হবে।

ড: দীপংকর রায়

কলকাতা

কিশলয় শিশু শিক্ষানিকেতন

সুসংহত সুশিক্ষার একমাত্র প্রতিষ্ঠান

এখানে শিশুদের লেখাপড়ার সঙ্গে শারীরিক, মানসিক এবং কারিগরি দক্ষতা বিকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থা রয়েছে।

যোগাযোগ ঃ গ্রাম এবং পোস্ট : নন্দকুমারপুর

জেলা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন : ৭৪৩৩৪৯

পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ফোন ঃ ৯৭৩২৭৮৫০৩৬

প্রিয় সম্পাদক

মঙ্গলগ্রহে চাষ হচ্ছে?

সমাজ সংস্কৃতি বিকাশের ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'উন্নয়ন' পত্রিকাটি হঠাৎ কলেজস্টীট পাতিরাম বুক স্টলে দেখলাম। পড়েও ফেললাম তক্ষুনি। চিকিৎসক অমিতাভ চৌধুরী তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন, "এখন তারা বলতে পারেন যে পৃথিবীটাই আর থাকার মত নেই, মার্সে গিয়ে থাকবো এলিজেবল পিপল্‌দের নিয়ে যাওয়া হবে মঙ্গলগ্রহে। এলিজেবলরা ধনী হয়।" এই বিষয়ে কয়েকটি তথ্য যোগ করতে চাই। প্রত্যেক মহাকাশচারির জন্যে প্রতিদিন ১.৮ কিলোগ্রাম খাবার প্যাকেজিং সহ মহাকাশে বয়ে নিয়ে যেতে হয়। ফলে চারজন মহাকাশচারি তিনবছর মহাকাশে থাকলে ১০০০০ কেজি খাবার লাগবে। সেজন্যে বিজ্ঞানীরা মহাকাশ স্টেশনে খাদ্য উৎপাদন করার বিষয় আগেই নজর দিয়েছেন। এই 'স্পেস ফার্মিং'-এর লক্ষ্য মহাকাশে বসবাসকারীদের জন্যে সুস্থায়ী খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা, সেই বিভিন্নগ্রহে মানুষের বসবাস, কলোনী স্থাপন যাতে সম্ভব হয়। সেজন্যে স্পেস ফার্মিং-এ হাইড্রোপনিক (Hydroponic) অথবা এ্যারোপনিক (Aeroponic) সিস্টেম ব্যবহৃত হচ্ছে যাতে মাটি ছাড়া সামান্য জলে কৃত্রিম আলোতে চাষ হতে পারে। নাসার বিজ্ঞানীরা ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে বিভিন্ন ধরনের চাষ নিয়েই কাজ করছেন। তারমধ্যে লেটুস, গম সহ অন্যান্য শষ্য আছে। এখানে ভেজিটেবেল প্রোডাকসন সিস্টেমকে বলে ভেজি। এটা একটা স্পেস স্টেশন গার্ডেন। মাইক্রোগ্র্যাভিটিতে চাষ হচ্ছে এই গার্ডেনের উদ্দেশ্য। এখানে বিভিন্ন রং-এর আলো ব্যবহার করা হয় যার দ্বারা সফলভাবে তিনধরনের লেটুস, চাইনিজ ক্যাবেজ, জাপানী মিজুনা মাস্টার্ড (Mizuna Mustard), রেড রাশিয়ান কালে (Red Russian kale), জিনিয়া ফুল চাষ করা সম্ভব হয়েছে। সুতরাং মঙ্গলগ্রহে বসবাস করার বিষয়টা খুব বেশী দূরের নয় সেটাতো বোঝাই যাচ্ছে।

বিভাস ষড়ঙ্গী
শোভাবাজার, কলকাতা-৭০০০০৫

কংক্রীটের জঙ্গলে উত্তাপ বেড়েই চলেছে

'উন্নয়ন' পত্রিকার মে-জুলাই ২০১৩ পড়লাম। পরিবেশ বিষয়টি নানা দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নানাজনে বিশ্লেষণ করেছেন। এটা ভালো একটা উদ্যোগ। অংশুমান দাস লিখেছেন, "মানুষের লোভ সবুজ ধ্বংস করে দিচ্ছে, ইট কাঠ পাথরে ভরে উঠছে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। কনস্ট্রাকসন যেন শেষ হবে না কোনদিন। চলতেই থাকবে। বাতাসে ভেসে বেড়াবে ধুলো।" এ প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা না বলে পারছি না। এদেশে মাত্র ৩% জায়গা নিয়ে এখন পর্যন্ত শহর এবং শহরতলি। আর সেখানে বসবাস করেন দেশের ৩৫% মানুষ। গত কুড়ি বছরে কলকাতায় নির্মাণ বেড়েছে দ্বিগুন আর গত দশ বছরে শহরে সবুজ কমেছে তিরিশ শতাংশ। এত কম জায়গায় এত মানুষ বসবাস করছে। বাড়িগুলির উচ্চতা বাড়িয়ে একটি বহুতল বাড়িতে এক একটি গ্রামের সবলোক বাস করতে পারে। এরকম পাঁচটা উঁচু অট্টালিকা মানে একটা পুরো গ্রাম পঞ্চায়েত। এবার সেইসব বাড়ির দেওয়ালের মোট যা আয়তন সেগুলি গরমে উত্তপ্ত হয়ে যায়। এখন কংক্রীট স্ট্রীল কাচ এ্যালুমিনিয়াম দিয়ে বাড়ি হয়। এই নতুন প্রযুক্তির বাড়ি, তার সঙ্গে যোগ হচ্ছে কংক্রিট আর ইস্পাতের ফ্লাইওভার, পিচের তৈরী কালো কালো রাস্তা, সাদা সিমেন্টের ঢালাই। তারা উত্তাপ শুষে নিয়ে ধরে রাখে। দিনের বেলা তাপমাত্রা যখন ৪০ ডিগ্রী হয়, ওইসব নির্মাণের উষ্ণতা তখন ৬০ থেকে ৮০ ডিগ্রী হয়ে যায়। এইসব নির্মান পরিকাঠামো শহরে বাতাস চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে। উত্তুরে বাতাস, দখিনা বাতাস শহরে ঢুকতেই পারে না। তারসঙ্গে এসি মেশিনের গরম হাওয়া বাইরে এসে গোটা শহরকে ক্রমশ জ্বলন্ত আগ্নেয় দ্বীপ করে তুলছে। গাড়ির দূষণের মিহিদানা (বর্ধমানের মিষ্টান্ন নয়) দূষণ এবং মোটাদানা দূষণ ওই তাপকে বয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় সারা শহরে। এর থেকে রেহাই নেই। সাহিত্যিক শীর্ষেন্দুবাবু যথার্থই বলেছেন যে যৌথ পরিবার ফিরিয়ে আনতে পারলে এত ঘরবাড়ি তৈরী হতো না।

মিনতি মিত্র
মহিষাদল, মেদিনীপুর

গাছেরা ব্যথা পেলে কাঁদে

ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'উন্নয়ন' পড়লাম। এরকম দরকারী পত্রিকা বাংলা ভাষায় আজকাল দুর্লভ হয়ে গিয়েছে। প্রকাশক এটির নিয়মিত প্রকাশ চালিয়ে যেতে পারবেন তো? এদেশে ভালো জিনিস বেশীদিন টিকে থাকে না। পুরো পত্রিকা জুড়ে লেখকরা তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টি থেকে শুধু পরিবেশ আলোচনা করছেন, অথচ পড়তে ভালোই লাগছে। বস্তাপচা গল্প,

কবিতা, ধর্ম, জ্যোতিষ ছাপিয়ে আপনারা দুর্মূল্য কাগজ নষ্ট করেননি সেজন্যে ধন্যবাদ দিতেই হবে। শরদিন্দু ব্যানার্জী লিখেছেন আদিবাসী "উচ্ছেদ করা হয় জঙ্গল সাফ করার জন্য"--- এই সাফ করার মানে পরিস্কার করা নয়। গাছগুলি কেটে ফেলা। "উড়িষ্যা, ঝাড়খন্ড, ছত্তিশগড়ে একই অবস্থা" তিনি বলেছেন। গাছপালার এই ধবংস প্রসঙ্গে এই ২০২৩ সালে গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞানের জার্নাল সেল-এ প্রকাশিত হয়েছে ইজরায়েলের তেল আভিব বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণার রিপোর্ট। এই রিপোর্টে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদল জানাচ্ছেন যে, গাছেরা ব্যাথা পেলে যন্ত্রণা হলে এমনকি অবহেলা করলেও তারা কাঁদে। তারা তাদের সন্তানদের চিনে নিতে পারে, সম প্রজাতির গাছেরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে। কিন্তু সেসব মানুষের শ্রবণ ক্ষমতার বাইরের শব্দ। বিজ্ঞানীরা আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স ব্যবহার করে গাছেদের কথাবার্তা এবং কান্না রেকর্ড করেছেন। বিজ্ঞানীরা টমেটো তামাক ভুট্টা গম আঙুর প্রভৃতি গাছে জল না দিয়ে, ডালপালা কেটে পরীক্ষা চালিয়েছেন। গাছগুলি তখন একটানা দশ থেকে বারোবার আর্তনাদ করে নিজেদের কষ্টের বিষয় জানিয়েছে। মানুষ যেমন ব্যথা পেলে আর্তনাদ করে ওঠে, ঠিক তেমনি ঘটেছে গাছেদের ক্ষেত্রে। অথচ শরদিন্দুবাবুর দেওয়া তথ্য থেকে জানতে পারলাম, তিন চারটি রাজ্যে গাছ কেটে জঙ্গল সাফ করে দেওয়া হচ্ছে। হয়তো তার ফলে আমরাও সাফ হয়ে যাবার রাস্তা সাফ করছি।

ডঃ ইন্দ্রানী সাহা
চিত্তরঞ্জন পার্ক, নিউদিল্লী

সুজলা সুফলা বাংলা কি মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে?

উন্নয়ন পত্রিকার মে-জুলাই ২০২৩ সংখ্যাটির প্রচ্ছদ খুব আকর্ষণীয় হয়েছে। এটি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার একটি বাড়ি থেকে আমি নিয়ে আসি, পড়েও ফেলি। এই পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক হতে চাই। ডাকযোগে এটি বাড়িতে পেতে চাই, তার পদ্ধতি জানাবেন। এই পত্রিকার ইন্টারনেট সংস্করণ কি প্রকাশিত হয়? পত্রিকার স্টলে খুঁজে পাইনি। এটি কি শুধুই পরিবেশ বিষয়ক পত্রিকা? এই চলতি বছরে পরিবেশ দিবসে অসহনীয় তাপপ্রবাহ চলছিল সারা রাজ্যে। ১৯৯০ সাল থেকে ২০২০ সালের মধ্যে ভারতে প্রতিবছর গড়ে ২৩টি তাপপ্রবাহ ঘটেছে। তার আগের ২০ বছরের তুলনায় এই সংখ্যাটা দ্বিগুণ। উত্তাপজনিত মৃত্যু বেড়েছে অনেক বেশী। শহরের আবদ্ধ উত্তাপে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হন বস্তিবাসী। তাঁরা শহরে আসেন গ্রাম থেকে অথবা অন্য রাজ্য থেকে। বস্তি অঞ্চলের

ঘরবাড়ি তৈরী হয় খুবই নিম্নমানের জিনিসপত্র দিয়ে যা তাপ নিরোধক নয়। এই শ্রমিকদের অনেকে তাঁদের কর্মস্থলে নির্মীয়মান ইমারতে অথবা রাস্তার ধারে ত্রিপল কিংবা প্লাস্টিকের তাঁবুতে বাস করেন যা তাঁদের জীবনীশক্তি ধবংস করে। এই উত্তাপ কর্মস্থলে শ্রমিকদের অনুপস্থিতি উৎপাদন হ্রাস ঘটাচ্ছে যার প্রভাবে ২০৩০ সালের মধ্যেই ভারতের জিডিপি তিন শতাংশ কমবে বলে অনেক সমীক্ষায় মনে করা হচ্ছে। একাধিক শহরে উৎপাদন, বিপনন, বিভিন্ন পরিষেবা, নির্মাণ কাজ এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের অনেক কাজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছে নিয়োগকারী সংস্থাগুলি। ফলে শ্রমিকরা পুরো মজুরী পাচ্ছে না। এ বছর সিকিমের গ্যাংটকে, দার্জিলিং, কালিম্পং-এ তাপপ্রবাহ ঘটেছে। তুলনায় রাজস্থানের মরুশহর জয়সলমির ছিল ঠান্ডা। সুজলা সুফলা বাংলা কি মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে? সে বিষয়ে উন্নয়ন পত্রিকার মতামত জানতে চাই।

অনির্বাণ ব্যানার্জী
সরিষা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

উন্নয়ন পত্রিকার প্রথম সংখ্যা পড়লাম। দরকারি ভালো উদ্যোগ। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ সিংহরায় মহাশয়ের রচনা জলদূষণ ও পরিবেশ লেখাটি আমাকে ভাবিয়েছে বিশেষ করে। সম্প্রতি জিওফিজিক্যাল রিসার্চ লেটার্স নামক একটি বিজ্ঞান পত্রিকায় সোল বিশ্ববিদ্যালয়, দক্ষিণ কোরিয়ার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় জিওং ইয়ম, মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়, হংকং পলিটেকনিক ইউনিভার্সিটির, ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস এর একদল বিজ্ঞানী একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন যা তাঁদের যৌথ গবেষণার ফল। তাঁরা জানিয়েছেন, ১৯৯৩ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে ২১৫০ গিগাটন ভূগর্ভস্থ জল তুলে নেওয়া হয়েছে। ১ গিগাটন মানে ১০০ কোটি মেট্রিক টন। এখন মাটির নীচ থেকে যে জল তোলা হয়, শেষ পর্যন্ত তা সমুদ্রেই গিয়ে মিশে যায়। ফলে ওই পরিমাণ ভূগর্ভস্থ জল সমুদ্র মিশে গিয়েছে যা সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধির একটা বড় কারণ।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার
কানপুর, উত্তরপ্রদেশ

বিলাসবহুল জীবন বজায় রেখে পরিবেশ উন্নয়ন হয় না

উন্নয়ন ত্রৈমাসিক পত্রিকা পড়লাম। পরিবেশ নিয়ে অনেকে অনেকরকম দরকারী বিশ্লেষণ করেছেন। আমিও আমার মতামত জানালাম।

উন্নয়ন কথাটি এক এক জনের কাছে এক এক রকম ভাবে ব্যবহার হয়। সাধারন অর্থে উন্নয়ন বলতে আমরা বুঝি উন্নতি অর্থাৎ চোখের সামনে দেখা ঝাঁ চকচকে শপিংমল রাস্তাঘাট, শৌচালয়, পানীয় জলের ব্যবস্থা বড় বড় হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ ও পর্যাপ্ত বিদ্যুতের সরবরাহ ইত্যাদি ইত্যাদি। একদিক থেকে ভাবলে হয়তো এগুলিও উন্নয়ন, আসলে সমাজে বাঁচতে গেলে আমাদের এগুলিও ভীষন দরকার তাই বাহ্যিক অর্থে হ্যাঁ এটাও উন্নয়ন।

পরিবেশ বিদ্যা নিয়ে যখন এম.এ করছিলাম, তখন গ্লোবাল ওয়ার্মিং, বনসৃজন, পরিবেশ দিবস কথা গুলির গুরুত্ব বুঝেছিলাম, প্রাকৃতিক পরিবেশের উন্নয়ন কীভাবে করতে হয় তার উপায়গুলি সম্পর্কে সম্মক ধারণা পেয়েছিলাম। তখন বুঝিনি সামাজিক উন্নয়ন নামে একটি কথা আছে। আমরা যে কমিউনিটি তে বসবাস করছি, সামাজিকভাবে তারও উন্নতি করা যায়। অর্থাৎ মানুষে মানুষে যে দূষণ, মতভেদ, বিতর্ক, তার উন্নয়নের কথাই এখানে বলা হচ্ছে। এইবার প্রশ্ন আমরা কোন ধরনের উন্নয়নে জোর দেবো? প্রাকৃতিক উন্নয়ন নাকি সামাজিক উন্নয়ন? অংশুমানবাবু দূষণ নিয়ে সামাজিক দূষণের যে ভাবনা দিয়েছেন সেটা বাঁধিয়ে রাখার মতো, সত্যি এই মুহূর্তে এটা একটা বড় দূষণ। প্রাকৃতিক দূষণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই সামাজিক দূষণটা নিয়েও ভাববার সময় এসেছে।

কিছুদিন আগে ডঃ দীপংকর রায়ের একটি ট্রেনিং এ থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। উনি খুব মজার একটা কথা বলেছিলেন। যেটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার না করে পারছি না। উনি বলেছিলেন আমরা সকলে ধনী হতে চাই, সকলে আর পাঁচটা ধনীদের মতো বিলাস বহুল জীবন কাটাতে চাই। যখন ধনী হলাম, তখন হাঁটা ছেড়ে গাড়ি ধরলাম, মাসে যেখানে একবার মাংস হত সেখানে সপ্তাহে তিনবার মাংস খাওয়া শুরু করলাম, হাতে টাকা পয়সা থাকার জন্য অতিরিক্ত মদ্যপান ও অসংলগ্ন জীবনযাপন আমাদের আরো বেশি করে গ্রাস করলো। অতিরিক্ত অলসতা ও ভালো খাওয়া দাওয়ার জন্য মোটা হলাম, শরীরে কোলেস্টেরল জমে গেল, হাইব্লাড প্রেশার তৈরি হল এবং বিভিন্ন রোগ শরীরে বাসা বাঁধলো। বাধ্য হয়ে চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হলাম, ডাক্তারবাবু বললেন, অলসতা দূর করুন, গাড়ী ছেড়ে যতটা সম্ভব হাঁটা অভ্যাস করুন, তেল মশলা খাওয়া একেবারে বন্ধ করুন। মাংস মাসে একবার তাও আবার ঝাল ছাড়া। একবার ভাবুন যে মানুষটা বিলাসবহুল জীবন কাটাবার জন্য ধনী হলেন, সেই কিনা পুনরায় আবার আগের মতো গাড়ি ছেড়ে হাঁটা শুরু করলেন, এবং আর পাঁচটা মধ্যবিত্তের মতো সাধারণ জীবন

কাটাতে বাধ্য হলেন।

এইবার বলুন এটা কোন ধরনের উন্নয়ন? এই উন্নয়নের জন্য কি উনি ধনী হতে চেয়েছিলেন? আপনি একে কোন ধরনের উন্নয়ন বলবেন?

তার মানে দেখুন উন্নয়নের মাপকাঠি শুধু টাকা দিয়ে বিচার করা হয় না, বিচার করা হয় তার চেতনার বিকাশ দিয়ে। তার উন্নয়ন প্রকাশ পায় সৃজনশীল চিন্তাভাবনার সঠিক প্রয়োগ দিয়ে। আসলে মানুষ তার উন্নয়নকে কীভাবে ধরে রাখতে হয় সেটাই জানে না।

দূষণ বলতে আমরা বুঝি জলদূষণ, বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা যে পরিবারে বা যে সমাজে বাস করি সেখানে যে দূষণ অহরহ ঘটে চলেছে সেই দূষণের কথা আমরা মাথায় রাখি না। আমরা কমিউনিটিতে অ্যাওয়ারনেস মিটিং শেষ করে বাড়িতে ফিরে মা-বাবার সঙ্গে ঝগড়া করি। স্মার্ট ফোনের অতিরিক্ত ব্যবহারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে রাতে ঘুমোতে যাওয়ার সময় সম্পর্কের দূরত্ব তৈরি করি। সাংসারিক উন্নয়নের জন্য স্বামী স্ত্রী দুজনেই চাকরি করার প্রয়োজন মনে করি, নিজেদের পরিবারের উন্নয়নের জন্য টিভি ফ্রিজ, ওয়াশিং মেসিন কোনো কিছুরই অভাব বাড়িতে রাখি না। স্বামী স্ত্রী দুজনের কর্মব্যাস্ত জীবনের জন্য নিজের বাচ্চাকে কাজের লোকের কাছে জমা দিয়ে বাবা মায়ের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চি ত করি। আবার ঐ বাচ্চা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বাবা মাকে দায়িত্ব নিয়ে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠায়। এইবার বলুন এটা কেমন উন্নয়ন? আমরা কি এই উন্নয়ন চাই? আর এই চক্র যদি চলতে থাকে সভ্যতার বাহ্যিক বিকাশ হয়তো ঘটবে কিন্তু সামাজিক উন্নয়নের যে দৃষ্টিভঙ্গি তা আগামী ১০০ বছরেও বদলাবে না।

সত্যি বলতে কি, আমরা এমন একটি দেশে জন্মেছি যেখানে স্কুলের পাঠ্যবইতে সামাজিক উন্নয়নের কোনো উপায় শেখানো হয় না। স্কুলের কোন সিলেবাসে নেই যে বৃদ্ধ বয়সে বাবা মাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাতে নেই। প্রতিটা শিশু তার জন্মগত কিছু প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে তার পূর্ণ বিকাশ ঘটানো সম্ভব হয়ে ওঠে না। তারপর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাকে উপযুক্ত পরিবেশে বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন করে তোলার জন্য তার সকল সম্ভাব্য ক্রিয়েটিভিটিকে কাজে লাগানোর প্রয়োজন পড়ে। সেই চিন্তাভাবনার ধারে কাছে না গিয়ে ঐ সময় বাবা মায়েরা আমাদের পিঠে পুস্তকের বোঝা চাপিয়ে ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, মাস্টার হওয়ার জন্য দম দিয়ে ছেড়ে দেয়, তার কিসে ভালোলাগা কিসে মন্দলাগা সেগুলি নিয়ে বাবা মায়েরা থাকে সম্পূর্ণ উদাসীন। আমাদের ছোটবেলা থেকে শেখানো হয় তুমি শিক্ষিত হও ইঞ্জিনীয়ার হও, ডাক্তার হও, কিন্তু এটা শেখানো হয় না তুমি মানুষ হও। আমার মনে হয় প্রকৃত উন্নয়ন সেদিনই হবে যেদিন মানুষ শিক্ষিত হওয়ার থেকে মানুষ হওয়াকে বেশী গুরুত্ব দেবে। শিক্ষিত হলে মানুষ হতে পারে বা নাও হতে পারে কিন্তু মানুষ হলে শিক্ষিত হতে পারবে সেটা সুনিশ্চি ত। সংস্কৃতি কি, খায় না মাখে এই ভাবনাটা সাধারণ মানুষের মাথার উপর দিয়ে চলে যায়। একটি আদর্শ মানুষের সংস্কৃতিতে কোন কোন বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার সেটা

কোনদিন আমাদের পাঠ্য বইতে শেখানোই হয় না, অথচ সেই না পাওয়া সংস্কৃতি কেউ যখন লঙঘন করে তখন আমরা তাকে গালিগালাজ করতে ছাড়ি না। আসলে আমরা নিজেরাই মাঝে মাঝে বুঝতে পারি না আমরা ঠিক করছি না ভুল করছি।

স্কুলেপাঠ্য বইয়ে যদি সংস্কৃতির গুরুত্ব কি তা শেখানো যায় তাহলে সেটা যে পরবর্তীকালে আমাদের সমাজেরই মঙ্গল সেটা আমরা মনেই করি না। আমরা, ইতিহাস, ভুগোল, বিজ্ঞান, অংক, ইংরাজী, বাংলা সবকিছুই পড়বো, এগুলো সবই তো আসলে শিক্ষিত হওয়ার জন্য, বড় বড় ডিগ্রি অর্জন করার জন্য, সামাজিক ভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। আজকে দেখুন হাজার হাজার ইঞ্জিনীয়ার ডাক্তার মাস্টার তৈরী হচ্ছে কিন্তু একটা রবীন্দ্রনাথ, একটা বিদ্যাসাগর তৈরী হচ্ছে না। সবাই শিক্ষিত হতে চাই কেউ মানুষ হতে চাই না। আজ সমাজের সিংহভাগ মানুষ সরকার দ্বারা প্রভাবিত তাই সরকারি উদ্যোগে মানুষকে পুঁথিগত বিদ্যার সাথে সাথে নীতিগত শিক্ষারও প্রশিক্ষণ দিতে হবে, একটি মানুষের স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপ পেতে গেলে তাকে পড়াশুনোর সঙ্গে নাচ, গান, অভিনয়, আবৃত্তি, কথাবলা, সামাজিক ও পারিবারিক দায়িত্ব ও মূল্যবোধেও সমান পারদর্শী হতে হবে। অবশ্য এখন সরকারীভাবে কন্যাশ্রী এবং সবুজ সংঘের সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে নয়নতারা এবং অন্যান্য বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে অ্যাওআরনেস করে সমাজ গড়ার উদ্যোগ নিচ্ছেন যেটা আগামী দিনে সমাজকে আরও শক্তিশালী করবে। বর্তমানে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে যেভাবে মহিলা স্বশক্তিকরণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে তা প্রশংসনীয়। সামাজিকভাবে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে মহিলাদের ভূমিকা অপরীসীম। শিক্ষিত মা মানেই শিক্ষিত সন্তান তৈরী করবে, এটা মাথায় নিয়ে প্রতিটা কন্যা শিশুকে পড়াশোনোতে উৎসাহিত করতে হবে। এই প্রসঙ্গে উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে মুম্বাইতে মাটুঙ্গা নামে একটি রেল স্টেশনের সাফাইকর্মী থেকে স্টেশন মাস্টার পর্যন্ত প্রায় ৪০ জনেরও অধিক যারা সকলেই মহিলা কর্মী হিসাবে নিযুক্ত। মহিলা স্বশক্তিকরণের জন্য এটা একটা উল্লেখযোগ্য উদাহরণও বটে।

আবার একাট বিষয় লক্ষ্য করুন এখন প্রায় প্রতিটা বাড়িতে ১৩ থেকে ১৯ বছরের ছেলে মেয়ে আছে কিন্তু একটু খোঁজ নিয়ে দেখুন যেকোন সরকারি হাসপাতালে বয়ঃসন্ধিকালীন সমস্যার প্রতিবিধানে অন্বেষা ক্লিনিকে আসা রোগীর সংখ্যা নিতান্ত কম, তার মানে কি তাদের কোন সমস্যা নেই? অথচ দিনের পর দিন অহরহ শোনা যায় বিষ খাওয়া ও গলায় দড়ি সহ একাধিক আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলেছে এবং তার বেশীরভাগই প্রণয় ঘটিত কারণে। আমাদের ভাবতে হবে সমস্যাটি কোথায়? আমরা কি আদৌ তাদের মনের কাছাকাছি পৌঁছতে পেরেছি। বর্তমানে চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য মানুষের মৃত্যুর হার অনেকাংশে কমে গিয়েছে আবার দেখুন শুধুমাত্র কমিউনিকেসন এর অভাবের জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি সত্ত্বেও মানুষ আত্মঘাতী হতে দুবার ভাবছে না। আসলে বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা এগোচ্ছি মনে হচ্ছে কিন্তু আবার কোথাও যেন

মনে হয় আমরা একহাত এগিয়ে পাঁচহাত পিছিয়ে পড়ছি। আমাদের সমাজে যা কিছু ঘটে চলেছে, সবকিছুই সাইকোলজি ও কমিউনিকেশনের উপর দাঁড়িয়ে। এই দুটি কথার আক্ষরিক অর্থ যদি আমরা মূল্যায়ন করতে পারি তাহলে সমাজের ৯০ শতাংশ সমস্যা মিটে যাবে বলে মনে হয়। এইবার প্রশ্ন আমাদেরকে যদি স্কুলের পাঠ্য বইতে এই বিষয়গুলি না শেখানো হয়, কমিউনিকেসন এর বাস্তব রূপায়ন যদি সমাজে পরিলক্ষিত না হয়, তাহলে আমরা কীভাবে সামাজিক উন্নয়ন দেখবো? তারপরেও আমরা আশা করবো আমরা উন্নয়নে এগোবো? বিদেশে স্কুলে মাদারস্ ডে/ফাদারস্ ডে পালন করে বাবা মায়েদেরকে কীভাবে শ্রদ্ধা সম্মান করতে হয় শেখানো হয়। ফিলিপিন্স নামক দেশে প্রতিটা ছাত্র নতুন ক্লাসে উন্নিত হলে প্রতি বছর ১০টা করে গাছ লাগানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। কবে আসবে আমাদের সেই দিন? আদৌ কি আসবে? সামাজিক উন্নতির উপায় হিসাবে আরও অনেক মাধ্যম আছে যেগুলি আমরা নিজেরাই তৈরী করে নিতে পারি। কোভিডের সময় আমরা দেখেছি মানুষ ইচ্ছে করলে পৃথিবীকে আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারে, দূষণমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে পারে। ছোট থেকেই যদি এই বোধ গুলোকে জাগ্রত করা হয়, নীতিগত দিক থেকে ভালো মন্দের তফাৎ বোঝানো হয় তাহলে আগামী দিনে সুদিন আসবে। প্রকৃত উন্নয়ন আনতে গেলে পুঁথিগত শিক্ষার সঙ্গে মানবিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হবে আর তাতে চেতনার জাগরণ ঘটবে। এনজিওতে কাজ করার সুবাদে বেশ কিছু বিদেশীদের সঙ্গে আলাপের সুযোগ হয়েছিল, ওদের ধৈর্য, দায়িত্ব, সংস্কৃতি অবাক করার মতো। যে কোন সমস্যায় ঝাঁপিয়ে পড়া দেখলেই বুঝতে পারি কেন ঐ দেশগুলো এত উন্নত। আমরা যদি আমাদের ছেলে-মেয়েকে এখন থেকে শেখানো শুরু করি অন্যের দুঃখে তার পাশে থাকা তোমার নৈতিক কর্তব্য, যেটা যতটা দরকার সেটা ততটাই ব্যবহার করবে, পয়সার জন্য নিজের নীতিজ্ঞান কখনও ভুলে যাবে না। একটা আদর্শ মানুষের গুণাবলীতে সবকিছু থাকলে প্রাকৃতিক পরিবেশের উন্নয়নের জন্য আলাদা করে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করার দরকার হয় না।

পরিবেশ মান্না
নন্দকুমারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

উন্নয়নের পদ্ধতি প্রক্রিয়া নিয়েই প্রশ্ন

দিব্যেন্দু সরকার

দিব্যেন্দু সরকার দীর্ঘ বহুবছর ধরে সরকারী উন্নয়ন ব্যবস্থায় সংযুক্ত কর্মী। বিডিও থেকে কর্মজীবন শুরু করে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব হিসেবে কাজ করেছেন। ইলেকসন কমিশনের চীফ এগজিকিউটিভ অফিসার ছিলেন। আবার বহু অসরকারী সিভিল সোসাইটি অর্গ্যানাইজেশনের সঙ্গে যুক্ত হয়েও বাংলার পশ্চিমের জেলাগুলিতে 'ঊষর মুক্তি' প্রকল্পের সফল রূপায়ণ করেছেন। রাজ্য সরকারের 'পঞ্চায়েতী রাজ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তিনি। এখন অবসর গ্রহণের পর কী বলছেন সুস্থায়ী উন্নয়নের পদ্ধতি নিয়ে? সেটা কী সত্যি করে সম্ভব? নাকি সাসটেইনেবেল ডেভেনপমেন্ট নিতান্তই একটা সোনার পাথরবাটি?

সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্টের আলোচনার গোড়াতেই যে বিষয়টা আসতে চায় সেটা হচ্ছে ডিজাসটার। মানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিষয়টা। কারণ পঁচিশ বছরের আর্থিক সামাজিক ডেভেলপমেন্ট মাত্র পাঁচ মিনিটের একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগে শেষ হয়ে যেতে পারে। আমাকে সরকারের বিভিন্ন দফতরে বিভিন্ন সময় আধিকারিক হিসেবে কাজ করতে হয়েছিল। আমি একেবারে গত শতাব্দির আশির দশকের শেষের দিকে অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার 'ময়না' নামে একটা ব্লকের বিডিও হিসেবে কাজ করছিলাম। ১৯৮৬ সালে নভেম্বরে আমি যোগ দিই। তার আগে একটা বড় বন্যা হয়েছিল। সেই বন্যার সময় ময়নাতে খুব বড় বন্যা হয়েছিল তা নয়, কিন্তু বন্যার ধাক্কাটা বেশিই হয়েছিল। ময়না ব্লকের বিশেষত্ব হচ্ছে সেটা একেবারে নদী বেষ্টিত। তার চারধারে নদী, প্রায় দ্বীপের মত, এখানকার জমি অনেক নীচু। একদিকে কংসাবতী নদী, একদিকে কেলেঘাই। পঞ্চায়েত প্রধানকে নিয়ে নদীর খাল চণ্ডিয়ার ধারে কীভাবে তারা বন্যা রুখেছিল সেইটা আমার নজরে আসে। নদীর পাড়ে রাস্তা, অনেকটা উঁচু। ওরা বাঁধ বলে, সেই বাঁধ কেটে তিনটে লেয়ার বাঁধটা দাঁড়িয়ে আছে। নদীর দিকে থেকে খানিকটা জায়গা কাটতে হয়েছে। তার উপরে উচু করা, তার উপরে আরেকটা ধাপে উঁচু করা এরকম তিনটে থাকে করা। এটা করার ফলে তিনফুট মতন নদীর বাঁধটাকে তুলতে পেরেছে। ফলে চন্ডিয়ার জল যত বেড়েছে, ওরা বাঁধটাকে উঁচু করেছে। একটা কথা শোনা যেতো যে, ময়নার লোকেরা বন্যা চায়। কারণ জল ঢুকে বন্যা হলে সরকারী ত্রাণের সুযোগগুলো নিতে পারবে। রিলিফ পাবার সুযোগ আছে বলে বন্যা চায়। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে ময়নার বাঁধ অতিক্রম করে জল যদি ঢুকে যায়, তখন মাসের পর মাস জলটা জমে যায়, কারণ ময়নার আকৃতি একটা গামলার মতন। মাসের পর মাস

চাষ বন্ধ থাকে। ঘরবাড়িতে ঢোকাও যায় না। ফলে ওখানে বন্যা মানুষ চায়, এটা সত্যি নয়। বরং বন্যা কীভাবে রুখে দিতে হয় সেটা তারা জানে। পরে সেই বাঁধটা রিপেয়ার করে মোরামের রাস্তা করা হল। তখন গ্রামপঞ্চায়েতে এনআরইপি কাজ হত। ওয়েজ এমপ্লয়েমেন্টের কাজ। একেকটা পঞ্চায়েতে পাঁচ থেকে দশ লাখ টাকা যেত। এখন যেমন কয়েক কোটি টাকা যায়, তখন সেটা অনেকটা কম ছিল। তার উপর ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বিরোধী দলেরও ভালোই প্রভাব ছিল। যেমন ময়নার এগারোটা পঞ্চ ায়েতের মধ্যে বেশিরভাগটাই তখন বিরোধীদের। পঞ্চায়েত সমিতিও । কিন্তু এমএলএ ছিলেন সরকার পক্ষের থেকে। এর ফলে জেলা পরিষদ থেকে কখনো কখনো অর্থ পাবার ক্ষেত্রে হয়তো অসুবিধা হয়ে থাকতে পারে। এন আর ইপি ছাড়া বিগএনআরইপি থেকেও কিছু টাকা পঞ্চায়েত সমিতিতে যেত। আরএলইজিপি বলেও একটা প্রোগ্রাম ছিল। এই টাকাও সমিতিতে যেত। এইভাবে চলছিল। ১৯৮৮ সালেও বন্যা হল। ওখানকার যিনি সভাপতি ছিলেন, তাঁর খুব গ্রহণযোগ্যতা ছিল জেলাপর্যায়ে। বিশেষ করে কংসাবতী ব্যারেজের জল ছাড়লে বা বন্যার সময়ে ইরিগেসন দপ্তরের সিনিয়ার অফিসাররাও ওনার কথাকেই গুরুত্ব দিতেন। তখনকার দিনে এত টিভি চ্যানেল ছিল না। মোবাইল ফোন ছিল না। রেডিওতে খবর আর স্থানীয় সংবাদের খবরে বলছে কংসাবতী ব্যারেজের জল ছেড়েছে। অফিস থেকে বাড়ি ফিরে স্থানীয় সংবাদ শুনছি। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখি সভাপতি নীচ থেকে ডাকাডাকি করছেন। রাত্রি আটটা বাজে। "বিডিও সাহেব চলুন যেতে হবে।" দুটো নৌকো রেডি থাকত। মেসিন দেয়া বোট। প্রচুর গানিব্যাগ নিয়ে সোজা উত্তর দিকে গোপালনগর গ্রাম পঞ্চায়েত। ময়না এক, দুই করতে করতে। গানিব্যাগ যেখানে নামানো হচ্ছে গ্রামবাসীরা দেখলাম রীতিমতো তৈরি, তারা অপেক্ষা করছে। তারাই মালপত্র নামাচ্ছে। নদীর মুখোমুখি এক্স জমিদারি বাঁধ মানে অনেককাল আগে জমিদারদের তৈরি বাঁধ। তারপর খানিকটা জায়গা ছেড়ে দ্বিতীয় বাঁধটা থাকত যেটা ইরিগেসন দপ্তর তৈরি করে। এই মাঝের এলাকাতেও চাষজমি ঘরবাড়ি হত। সেটাকে স্পিল এরিয়া বলে। সেখানে জল ঢুকলেও ক্ষতি হত অনেকটাই। বাঁধের গায়ে ইঁদুর গর্ত তৈরি করতো। স্থানীয় লোকে সেই গর্তকে বলত 'ঘোগ'। সেই গর্ত দিয়ে জল ঢুকে আসত। ঘোগের ভিতর দিয়ে জল ঢুকে ওপাড়ে চলে যায়। কিছুক্ষণ এরকম ঘোগের ভিতর দিয়ে জল ঢুকলে বাঁধটার ক্ষয় হতে শুরু করে। ভেঙে যায়। ফলে সর্বশক্তি দিয়ে মানুষ চেষ্টা করতো যাতে মূল বাঁধটা মানে মেইন বাঁধটা, যেন না ভাঙে। চাইতো স্পিল এরিয়াটাকে রক্ষা করতে, যাতে চাষজমির ক্ষতি না হয়। অন্যদিকে উত্তর দিক দিয়ে একবার জল ঢুকে যাওয়া মানে সেতো বের হবে না। ময়নার সাতাশিটা মৌজার মধ্যে পঞ্চাশটাই ভেসে যাবে। গতবছর ঘাটালে বন্যা হল, আনন্দবাজার পত্রিকা ঘাটালে বন্যার খবর ছেপেছিল, তার পাশেই ১০০ বছর আগেও ঘাটালে বন্যার খবর আনন্দবাজার তুলে ধরেছিল। তারমানে ১০০ বছর ধরে ঘাটালে বন্যা হচ্ছে। বন্ধ করা যায় নি। কিন্তু আমি সাতবছর ময়নার বিডিও ছিলাম।

একটাও পরিপূর্ণ বন্যা দেখিনি। কিন্তু অন্তত তিনটে বছর গিয়েছে যখন 'প্রায় বন্যা পরিস্থিতি' তৈরি হয়েছিল। মানুষ বিভিন্নভাবে বন্যা রুখেছিল। ময়না বেসিন ড্রেনেজ স্কিমটা বড় স্কিম। ময়নাতে প্রচুর খাল আছে, তাদের নেটওয়ার্ক আছে। সেই খাল দিয়ে জলগুলো বড় ক্যানেলে বের করে দেবার, মানে কেলেঘাই নদীতে জলটা ফেলার একটা ব্যবস্থা করে বন্যা দূর করা গেছে। ফলে ১৯৮৪ সালের পর থেকে ময়নায় বড় বন্যা হয়নি। অথচ বন্যা হলেই ময়নার নাম করা হয়। একবারতো আমি ছুটিতে বাড়ি এসেছিলাম। দুরদর্শন দেখাচ্ছে ময়নায় বন্যার দৃশ্য। খবর নিয়ে জানলাম বন্যা হয়ইনি। ওদের স্টক ছবি বের করে দেখাচ্ছে। প্রায় বন্যার মত পরিস্থিতি, কিন্তু বন্যা হয়নি। ময়নায় এভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আটকানো গেছে। কিন্তু ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান বা কেলেঘাই মাস্টার প্ল্যান ঠিকমত বাস্তবায়ন হয়নি। মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়ন মানে অনেক টাকা লাগবে। ভারত সরকারের থেকে একটা বড়ো টাকা এ বাবদ পাবার কথা। পাওয়া যায়নি। বাম আমল থেকেই সেসব ঝুলে আছে। এতবছর ধরে বাস্তবায়ন না হবার ফলে নদীর নাব্যতা আরো কমে গেছে। অথচ নদীর জল আসা বা জল ছাড়া কিন্তু থেকে গেছে। ফলে নদী তার বুকের মধ্যে যে জল ধরে রাখতে পারতো, সেটা পরিমানে কমে গেছে। ফলে ঘাটালে, পটাশপুরে বন্যা হবে। ময়নায় মাস্টার প্ল্যানটা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে। সেখানে বন্যা নেই। ফলে বোঝাই যাচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিন্তু রোখা যায়। প্ল্যান ঠিকমত বাস্তবায়ন হলেই রোখা যায়। নাহলে কোনো ডেভেলপমেন্ট কোনদিন সাসটেইন করবে না।

আরেকটা বিষয়ে বলতেই হবে। সভাপতি বসতেন পঞ্চায়েত সমিতিতে। একটাই ঘর সভাপতির বসার জায়গার পিছনে ময়না ব্লকের একটা ম্যাপ ছিল। ময়নার একটা করে রাস্তা মোরাম দেয়া হত, তিনি ম্যাপের সেই রাস্তাটাকে লাল রং দিয়ে দিতেন। তাঁর বক্তব্য ছিল গোটা ময়নার রাস্তা লাল করতে হবে তবে তিনি বুঝবেন তিনি সফল হয়েছেন। যদিও তিনি ঘোর বিরোধী সমর্থক। কিন্তু মোরামের রং তো লাল। এই সভাপতি বর্ষা শুরু হলেই বাড়ি থেকে লোটা কম্বল নিয়ে পঞ্চায়েত সমিতিতে চলে আসতেন। থেকে যেতেন। রাত্রে ওখানেই ঘুমাতেন। সকালে উঠে বিছানাটা গুটিয়ে ওখানে রেখে দিতেন। এতটাই তাঁর ডেডিকেসন ছিল যে, বাড়ি থেকে সমিতিতে আসার সময়টুকু নষ্ট করতেন না। এরকম উন্নয়নমুখি একজন মানুষকে দেখে আমারও কাজের জায়গায় কাজের প্রতি ভালোবাসটা বাড়িয়ে দিয়েছিল। এ থেকে বোঝা যায় 'এমন কি' একজন নির্বাচিত পলিটিকাল লোকের মধ্যেও এই স্তরের ডেডিকেশন দেখেছি। এই 'এমন কি' কথাটা বলেছি এখনকার অবস্থা বিবেচনা করেই। এখনকার দিনে এই ডেডিকেশন প্রায় অমিল। সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট হতে হলে, এই আজকালকার মতন তাৎক্ষণিকভাবে কিছু পাবার বা পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা চলবে না। সুস্থায়ী হতে হলে তখন যেটা দেখেছি, গ্রামের মানুষ শ্রম দিচ্ছে, কন্ট্রাকটার আছে আর আমাদের সরকারী দপ্তর এই তিন দল মিলে কাজ করতাম। আমাদের টাকা কম। কন্ট্রাকটার নেই। এক্স জমিদারি বাঁধে কাজ করার সময় দেখতাম

সরাসরি সভাপতি, বিডিও, প্রধান এঁরা সবাই মাঠে নেমে পড়তেন। মানুষ কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজে আসতেন। তাদের খাবার ব্যবস্থা করতাম। রান্না হত। প্রায় ভলান্টারি শ্রম দিতেন। রিসোর্স বাড়তি হলে কিছু পরিশ্রমিক দেওয়া যেত। কিন্তু পারিশ্রমিকের জন্যে মানুষ অপেক্ষা করতেন না। এক্স জমিদারী এমব্যাঙ্কমেন্টে কাজ হচ্ছে। যতক্ষণ পারিশ্রমিকটা নিশ্চিত না হচ্ছে ততক্ষণ মানুষ কাজ করবেন না, বা যতটা পারিশ্রমিকের কথা হয়েছে, ততটা না পেলে কম কাজ করবেন এসব প্রবণতা ছিল না। গানিব্যাগ মানে চটের বস্তা নিয়ে গেছি, তাতে মাটি ভরা হচ্ছে। জল বাড়ছে, বাঁধের উপর সেই মাটি ভর্তি ব্যাগও চাপছে। এরকম করে চারটে স্তর পর্যন্ত মানে একটা বস্তা মাটি ভরে একফুট উচু হলে, চারটে বস্তায় চারফুট উচু করে দেয়া হচ্ছে বাঁধটাকে। মানুষ নিজেরাই সেটা করেছেন। এই নদীর সামনের বাঁধটাকেই এক্স জমিনদারি এমব্যাঙ্ক মেন্ট বলা হয় সরকারীভাবে। ফরোয়ার্ড এমব্যঙ্কমেন্ট। এটাই পঞ্চায়েত দেখে। পিছনের দ্বিতীয়টাতে আমাদের কোন কাজ নেই। ওটা ইরিগেসন দপ্তরের। ওই ফরোয়ার্ড এক্সজমিদারি বাঁধও ইরিগেশন দপ্তর টেক ওভার করে। এই টেক ওভার করার পরে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেরা বাঁধ বাঁচানোর চেষ্টা করছিল, সেটা শেষ হয়ে গেল, ভলান্টারি উদ্যোগীটা নষ্ট হয়ে গেল। মানে ডেভেলপমেন্টকে সাসটেইনেবল করতে হলে পিপলস পার্টিসেপেসন চাই। জনগন নিজে অংশগ্রহণ করলে সেটার মালিকানা ভোগ করে। বুক দিয়ে সেটা রক্ষা করে, সেই ব্যবস্থাটাই সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্টের গুরুত্বপূর্ণ দিক। ওটাই এখন বন্ধ হয়ে গেছে। ওই সভাপতির মতন ডেডিকেশনও নেই আজকাল। পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়নও হয় না। এই তিনটিই যদি অনুপস্থিত থাকে, কী করে সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট হবে? মানুষ বন্যা চান রিলিফ পাবেন বলে, এই প্রচারিত ধারনাটাও একেবারে ভুল।

ধরা যাক প্রত্যেক জেলায় একটা করে ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন প্ল্যান বা ডিজাসস্টার ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান (ডি এম পি) থাকে। আমি সুন্দরবনে, চব্বিশপরগনার কাজে যুক্ত ছিলাম। মোটামুটিভাবে দেখেছি একটা তথ্যাভান্ডার ওদের রেডি করা আছে। সেটাই চলছে। এ বছরের ডিএমপি সেটা আগের বছরের মতই রিপিট হচ্ছে। কিন্তু একটা ডিজাসটার ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান করতে হলে মাঠে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে যেটা করা দরকার, আমার মনে হয় এই সম্পর্কগুলো কোথাও একটা হারিয়ে গেছে। আমরা প্রত্যেকবছর অতীতে এই প্ল্যান নতুন করে তৈরি করতাম।

একবারের একটা ঘটনা বলি। তাহলে তিনটের সঙ্গে একটা চতুর্থ সমস্যাও চোখে পড়বে। আমি প্রচুর গানিব্যাগ চাইতাম। সেবার গানিব্যাগ পাওয়া যাচ্ছিল না। কেন পাওয়া যাচ্ছে না? ইরিগেসন ডিপার্টমেন্টের গানিব্যাগের সাপ্লাই যেখানে আছে, সেখানকার যিনি এ্যাসিট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার তিনি কোনো কারণে নেই, চাবিটা তাঁর কাছে। ওদিকে জল মেইন এমব্যাঙ্কমেন্টে চলে এসছে। ফলে আমিতাভ মুখার্জী এসডিও কে আসতে হল। মানে সাবডিভিশাল ম্যাজিস্ট্রেটকে এসে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তালা ভেঙে গানিব্যাগ বের করা

হয়। একে বলে কোঅর্ডিনেশন গ্যাপ। এটাও খুব বড় সমস্যা। সমন্বয়ের অভাব। সাবডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট দাঁড়িয়ে থেকে তালা ভাংছেন চটের কয়েকটা বস্তা বের করার জন্যে, এটা ভাবা যায়? তাহলে জনগনের পার্টিসিপেশন, নেতাদের ডেডিকেশন, দপ্তরের কোঅর্ডিনেশন, প্ল্যানিং কোনোটাই ঠিক নেই। যেটা আছে, তার একটা উদাহরণ দিই।

একবার খুব বড়ো বন্যার পরিস্থিতি তৈরি হল। আমরা প্রচুর রকমের চেষ্টা করছি আটকাবার। প্রচণ্ড চাপের বিষয়, কংসাবতীর একদিকে তমলুক পাঁশকুড়া, একদিকে ময়না, কোনো একটা রাজনৈতিক দল রটিয়ে দিল যে, কোলাঘাট থার্মাল পাওয়ারের ক্ষতি যাতে না হয়, তাই এসডিও সাহেবের ওখানে মিটিং করে সিদ্ধান্ত হয়েছে ময়নার দিকটার বাঁধ ভেঙে কংসাবতীর জলটা ময়নায় ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। এরকম একটা জিনিস বাজারে ছেড়ে দেওয়া হল। মনে আছে, টানা সাতদিন ধরে আমি এবং জয়েন্ট বিডিও অফিসেই রয়েছি। অফিসের টেবিলেই একটু শুয়ে বিশ্রাম করি। বাকী সময় বাঁধরক্ষার লড়াই চালাচ্ছি। যখন ওই খবরটা গেল, জনগণ পাগোলের মতো মারাত্মক হামলা করলেন বিডিও অফিসে আমাদের উপর। অনেক লোক আমাদের আহত হলেন, সভাপতি লাঞ্ছিত হলেন পথেই। এসডিও এলেন ভোর বেলায়। সুনীল গুপ্ত, প্রথমেই তিনি বিডিও এবং জয়েন বিডিওকে বললেন আপনারা উপরে গিয়ে ঘুম দিন। উনি অলপার্টি মিটিং ডেকে খুব কড়াভাষায় বললেন, যেভাবে এনারা বন্যা রুখছেন, তারপরে এভাবে বিডিও অফিসে হামলা, সভাপতির উপর হামলা বরদাস্ত করা হবে না। সর্বোচ্চ পর্যায়ে এ্যাকশন নেবো প্রশাসনিকভাবে। এইভাবে বিষয়টা নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল। সুতরাং একদিকে নেই হয়ে যাচ্ছে পিপলস পার্টিসিপেশন, লীডারদের ডেডিকেশন, ডিপার্টমেন্টের কোঅর্ডিনেশন এবং প্ল্যানিং। চারটে জিনিস দুর্বল হয়েছে। আছে শুধু স্যাবোতাজ করার প্রবণতা আর তাৎক্ষণিক কিছু লাভ পাবার প্রত্যাশা, এগুলো বিভিন্ন লোকের মধ্যে বেড়ে চলেছে। যদিও সেটা চিরকাল ছিল কিছু মানুষের। এখন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যাই হোক, ডিজাসটার ছেড়ে এবার ডেভেলপমেন্টের কথা বলব।

আরেকবারতো জল ঢুকে কয়েক একর জায়গায় ওয়াটারলগ সহ পাঁচ ছয়ফুট উঁচু বালির স্তর জমে গিয়েছিল। ওখানে আমরা জেলাপরিষদ থেকে স্পেশাল একটা স্কিম করে বালিটা অপসারণ করেছিলাম। প্রথমবারের টাকায় তিনফুট বালি সরানো হল। তারপর প্রচুর বাদাম চাষ এবং তরমুজ চাষ করা হল। তারপর জমিটা ঠিক হল। দ্বিতীয়বারের টাকায় জমিটাকে ধান জমিতে ফেরাতে পেরেছিলাম। একটা বড় দিঘির মত হয়েছিল ডিপ্রেসনটাতে।

তখনকার দিনে টাকাতো আমাদের বেশী থাকতো না। আমরা যেটা করতে পারতাম সেটা হচ্ছে মোরাম রাস্তা। বর্ষায় মোরামগুলো ধুয়ে যেত। তখনকার দিনে মেইন রাস্তা ছাড়া বাকি সবই মোরামের রাস্তা। প্রতিবছর তারজন্যে রেকারিং খরচ হবে। কতটা ভেঙেছে তার মাপ ঠিকমতন না হলে অর্থ অপচয়ের সম্ভাবনাও থাকে। তাই আমরা

মোরাম রাস্তা আর করতে চাইনি।

আমি এবার দার্জিলিং-এর ঘটনা বলি। এমজি এন আরইজিএর কমিশনার হিসেবে প্রথম যখন গেলাম একটা ব্লগ লিখেছিলাম। একটা সময় মহাত্মাগান্ধীর নামটা স্বাধীনতার সঙ্গে সংযুক্ত করেই মানুষ জানত। পরবর্তী সময়ে স্মৃতিতে সেটা ফিকে হয়ে যায়। সেইসময়কার মানুষগুলি চলে গেছেন। কিন্তু দার্জিলিং কালিম্পং ওই পাহাড়ি এলাকার মহাত্মাগান্ধীর নামটা নতুন করে ঘরে ঘরে ফিরে এসেছে। তার কারণ ওখানে প্রতি ৫০০ মিটারে একটা করে জীপেবল রোড পাওয়া যাবে। মানে গাড়ি যাবার পথ, ওরা বলে জীপেবল রোড। আর প্রতি ২০০ মিটারে একটা করে পনি রোড পাওয়া যাবে। পনি রোড মানে টাট্টু ঘোড়া যে রাস্তা দিয়ে যেত, ধাপকাটা রাস্তা। এই এনআরইজিএ যে কী পরিমান কমিউনিকেশন ক্ষেত্রে পরিবর্তন এনে দিয়েছে, সেটা পাহাড়ে গেলে পরিষ্কার বোঝা যায়, তখন এটা দেখে আমার মনে হয়েছিল খুব ভালো কাজ হয়েছে। কিন্তু যতদিন গেল, আমার বোঝার জায়গাটা আরো পরিস্কার হল। বুঝতে পারছিলাম যে পাহাড়ি অঞ্চলে যে পরিমান সিমেন্ট কংক্রীটের লোড চাপছে রাস্তা করতে গিয়ে হোটেল, ঘরবাড়িতো আছেই, তার সঙ্গে ধসগুলো প্রোটেকশন দেবার জন্যেও সিমেন্টের কাজ হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রচুর পরিমান কংক্রীট হয়েছে। সকলেরই এটাতে খুব উৎসাহ ছিল। তার কারণ এনআরইজিএ তে ষাট শতাংশ খরচ অদক্ষ শ্রমিকদের পারিশ্রমিক, বাকি চল্লিশ শতাংশ সেমিস্কিল কর্মীর পারিশ্রমিক এবং কাঁচামালের জন্য বরাদ্দ। সমতলে এই হিসাব মিলিয়ে কাজ করা কঠিন হত, কাজ আটকেও যেত। দার্জিলিং এ এই সমস্যা ছিল না। কারণ সিমেন্ট বালি ছাড়া পাথরের খরচাটা বেঁচে যেত, শ্রমিকদের ওয়েজ দিতে সমস্যা ছিল না। পুরো কাজটা দার্জিলিং পাহাড়ে কন্ট্রাকটরকে দেয়া হত। এই কন্ট্রাকটরকে দেবার বিষয়টা এনআরইজিএ-র নীতিতে ছিল না। গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি তারা এই কাজটা নিজস্ব সুপারভিসনে করবে।

পশ্চিমবঙ্গে লেবারের ওয়েজটা কোনোদিন সময়মতন দেয়া যায় না। তার কারণ যতটা কাজ করার কথা, সবসময় তার থেকে আমরা বেশি কাজ করে থাকি। তারফলে সবসময় একটা নেগেটিভ ব্যালেন্স চলতেই থাকে। মানে টাকায় ঘাটতি। কয়েক হাজার কোটি টাকার নেগেটিভ ব্যালেন্স নিয়ে আমরা একটা বছর শুরু করতাম। এখন সিস্টেম পালটেছে। ফলে বেশিদিন টাকা পড়ে থাকলে শ্রমিক বিক্ষোভ হত। কিন্তু এ সমস্যা দার্জিলিং-এ ছিল না। তার কারণ কাজটা কন্ট্রাকটররাই করতেন।

দার্জিলিং এ পঞ্চায়েত সিস্টেম প্রায় ছিল না, ইলেকটেড বডি নয় এটা, ব্লকের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ হত। যাই হোক আমরা লক্ষ্য করলাম, দার্জিলিং এর খাবার জলের উৎস হচ্ছে ঝর্নাগুলো, সেগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। ওই অত রাস্তা, পাহাড়ের ধস আটকানোর জন্যে সিমেন্ট, ঘর বাড়ি তৈরির ফলে ঝরনার গুলো রিচার্জ হয় না। রিচার্জ এরিয়াতে কংক্রীট হয়েছে। এছাড়া ঝুমকাল্টিভেসনের ফলে মাটিটা লুজ হয়ে যায়, বৃষ্টির জলটা ভেতরে

চুঁইয়ে ঢুকতে পারত। ঝুমচাষ বন্ধ হয়েছে। প্রয়োজনেই বন্ধ হয়েছে। কারণ কালটিভেশন হিসেবে এটা খুব পজিটিভ বিষয় নয়। এটা বন্ধ হবার ফলেও জলের সোর্স রিচার্জ হয়নি। দার্জিলিং পাহাড়ে শুধু ঝুম নয়, কাল্টি ভেসনটাই প্রায় বন্ধ। নিজের ঘরের চারপাশে কিছু গাছ লাগান বা কিছু কোয়াশ এর ফলন হল। কিন্তু চাষের উপর নির্ভরশীল অর্থনীতি পাহাড়ে নেই। ফলে ভারত রুরাল লাইভলিহুড ফাউন্ডেসানের সাহায্যে নিয়ে কয়েকটা সিভিল সোসাইটি সংগঠনকে নিয়ে আমরা স্প্রিং রিজুভিনেসনের কাজ শুরু করলাম।

ওয়াটারশেড এলাকায় উচু জমি থেকে জল আসে। নামতে থাকে তারপরে। আপল্যান্ড, মিডিয়াম আপল্যান্ড, মিডিয়াম লো ল্যান্ড, তারপর লো ল্যান্ড। বর্ষার সময় জলটা হু হু করে নেমে আসে, টপ সয়েল ধুয়ে নিয়ে আসে। সেই জলটা শেষপর্যন্ত স্ট্রীম দিয়ে বেরিয়ে চলে যায়। ওই হচ্ছে ওয়াটারশেড এলাকার টপোগ্রাফির বিশেষত্ব, বৃষ্টি বাঁকুড়া পুরুলিয়াতে কম হয় না। কিন্তু বৃষ্টির জলটা ধরে রেখে কিছু কাজ করার ঘটনাটা ঘটে না। ফলে ওয়াটার শেডের জন্যে উপরের দিকটায় কিছু গাছপালা তৈরি করলে টপসয়েলটা ধোবে না। উঁচুতে কাঠের গাছ, আরেকটু নীচ অচার্ড। এই গাছের মধ্যে দিয়ে জল নামবে মানে গালি তৈরি হবে। গালি তৈরি হলে টপসয়েল ধুয়ে যাবে। তাই গালি প্লাগিং করতে হবে।

ওয়াটারশেড হচ্ছে জলবিভাজিকা। আমরা সবাই কোনো না কোনো জলবিভাজিকার মধ্যে বসবাস করি। খুব বড় নদীর একটা বেসিন থাকে তার সাব বেসিন থাকে। ধরাযাক গঙ্গানদীর যেসব জায়গা থেকে গঙ্গায় জল ঢোকে, সেই প্রতিটা সোর্স হচ্ছে গঙ্গা বেসিনের অংশ। ধরা যাক বিদ্যাধরি কোথাও একটা গঙ্গায় মিলেছে। তাহলে বিদ্যাধরী গঙ্গার একটা সাববেসিন হয়ে গেল। বিদ্যাধরীতে জল আসছে একটা বড় খাল থেকে। সেই খালটা হচ্ছে একটা ম্যাক্রোওয়াটার শেড। সেই খালে আবার কোনো উপখাল থেকে জল আসছে। সেটা একটা মাইক্রোওয়াটার শেড। এভাবে ছোটো ছোটো করে গোটা জিনিসটাকে ভেঙ্গে ফেলতে পারি। মূলত পাঁচশো হেক্টর জায়গা জুড়ে মাইক্রেওয়াটারশেড করা হয়। সেটা চারশো হতে পারে কমবেশি। চারপাশ দেখে নিয়ে উচু থেকে জল নামছে কোথায় কী করে বের হচ্ছে সেই গোটাটা নিয়ে একটা মাইক্রোওয়াটার শেড। এই মাইক্রোওয়াটার শেডগুলো চিহ্নিত করে তাদের উচু জায়গাগুলোর ট্রিটমেন্ট হবে। এনআরইজি এতে 'ক' প্লটে করছি। অনেকটা দূরে গিয়ে 'খ' প্লটে আরেকটা কাজ করছি, আরো অনেকটা দূরে গিয়ে 'গ' প্লটে করছি। হয়তো ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথবা বাঁধ বাঁধছি। এগুলোর মধ্যে অর্গ্যানিক একটা লিংকেজ সহজে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। মানে যোগসূত্রটার কথা বলছি। কার জমিতে কাজ করব সেটা পঞ্চায়েত ঠিক করে। পঞ্চায়েত তার বিভিন্ন ডায়নামিকস দিয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। সেই লোক কীভাবে কার সাথে যুক্ত, সে কী করে না করে ইত্যাদি ডায়নামিকসে পঞ্চায়েত সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, তার ফলে কীভাবে কাজ করব সেটা কোন পরিস্কার একটা সিস্টেমে আসে না। তার পরিবর্তে আমরা ২০১৬-১৭ সালে ঊষর মুক্তি শুরু করলাম।

বীরভূম বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূমের কিছুটা এলাকায় সরকারী কাজ ভালো হয়। এন আর ইজি এতেও হয়। উত্তর দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলী, নদীয়া পূর্ববর্দ্ধমান এসব দিকে খরচ বেশি হলেও কাজের কোয়ালিটি, মানুষের কাছে উপকারটা পৌঁছানো ইত্যাদিগুলো পশ্চিমের জেলাগুলোতে চিরকালই ভাল। কিন্তু ভালো হলেও কাজগুলো এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে হয়। এগুলোর মধ্যে মালাগাঁথার কাজটা ঠিকভাবে হয় না। ফলে একেকটা বিভিন্ন দ্বীপ তৈরি হয়ে যায়।

এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপগুলো তখনি একটা জায়গায় আসবে যখন এগুলো জুড়ে আমরা একটা মূল ভূখণ্ড তৈরি করতে পারব। সেই চেষ্টাটাই হয়েছে ঊষরমুক্তিতে। আমি স্কিম বাস্তবায়নের মানসিকতায় না থেকে ট্রিটমেন্ট করব। পৃথিবীর মাটি একটি ট্রিটমেন্ট চায়, কিছু একটা করে মাটিটাকে শক্তিশালী করতে হবে। কীভাবে করব? সেখানে জল দিতে হবে। জলের যোগান বাড়াতে হলে গর্ত খুঁড়তে হবে। জলটাকে কোথাও রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। সমস্যা তো হচ্ছে জলটা বেরিয়ে চলে যায়। আমি বেরুতে দেব না। আটকে রাখব। কীভাবে আটকাব? কিছু জায়গায় বাঁধ দেব। কোথাও গত খুঁড়ব। কোথাও গাছ লাগাব। গাছ মানেই একটা বাধা, জল সেখানে ধাক্কা খাবে। যেখান দিয়ে চলে যাচ্ছে, সেখানে গর্ত খুঁড়ে রাখব, গর্ত থেকে যদি উঠে বেরিয়ে যায়, সেখানে খানিকটা বাঁধ রাখব। এইভাবে গাছ-গর্ত-বাঁধের কম্বিনেশন করলে কী হবে? অতিথি বাড়িতে এলে তাকে অভ্যর্থনা করতে হয়। মানে তাঁকে দাঁড় করালুম। বললুম আসুন। তারপর তাকে বসতে দিলাম, খাবার ব্যবস্থা করে দিলাম, শোবার ব্যবস্থা করে দিলাম। ঠিক একইভাবে জলটাকে বাঁধ দিয়ে আটকালাম। বসার জন্যে জায়গা দিলাম, ফাইনালি জলটা মাটির তলায় ঢোকাবার জন্যে একটা সিস্টেমের মধ্যে গর্তগুলো খুঁড়লাম। তাহলে যেটা হবে, পশ্চিমাঞ্চলের সব জায়গায় যে হু হু করে জল নেমে যায়, ঘোলা জল, প্রচুর মাটি মিশে আছে। টপসয়েল ধুয়ে যায়। পার্শ্ববর্তী জমি নষ্ট হয়ে যায়। একটা ওয়াটার শেড এরিয়া ধরে কোথায় কোনটা করতে লাগবে, তার ম্যাপিং করে ডিপিআর হবে। কন্টিগুয়াস এলাকায়। এটা পশ্চিমের জেলায় করেছি। সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশনকে সঙ্গে নিয়ে।

তার কারন এইসব ডেভেলপমেন্টের কাজ করতে হলে যে পরিমান স্থিতধী হয়ে কাজ করতে হয়, সরকারী সিস্টেম বা পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় সেই স্থিতধী অবস্থানটা থাকে না। আমরা যারা সরকারী কাজ করি, তাদের কাছে আরো অনেকগুলো কাজের মধ্যে ডেভেলপমেন্ট একটা অংশমাত্র। ফলে তারা অন্যকাজে সময় দিয়ে, তা থেকে সময় বের করে যে পরিমান সময় শ্রম এবং মাথা দিতে হয়, তাঁরা সেটা সাধারণভাবে দিয়ে ওঠেন না।

সিভিল সোসাইটির কী আছে, আমার মানে সরকারের কী আছে? আমারকাছে মানে গর্ভনমেন্টের কাছে অর্থ আছে। দ্বিতীয় হচ্ছে গর্ভনমেন্টের একটা ডিসিপ্লিনারি সিস্টেম

আছে। সেটা শক্তিশালী হোক না হোক, নানা প্রশ্ন উঠুক, সেটা আছে। পঞ্চায়েত বলে একটা ব্যবস্থাপনা আছে। যেখানে হায়ারারকালি এন্টায়ার সিস্টেমটা রান করে। এই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একটা অথরিটি আছে। আর আমার অনেক ডিপার্টমেন্টও আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। একসপার্টও আছে।

কিন্তু যেটা আমার নেই তা হল, একটা ডেভেলপমেন্টের কাজকে সাসটেইনেবেল করে তুলতে হলে যে ফোকাসড ডেডিকেশন লাগে সেই ডেডিকেশন দিতে চাওয়ায় মত, পাওয়ার মত লোকের অভাব আছে। দুই হচ্ছে ভিসনটা কোথাও ব্লক হয়ে আছে। এইখানেই আমরা সিভিল সোসাইটি অর্গনাইজেশনকে যুক্ত করেছিলাম। তাঁদের খরচটা দিয়েছিল ভারত রুরাল লাইভলিহুড ফাউন্ডেশন।

এইটা এইখানে গুরুত্বপূর্ণ যে পুরোদস্তুর একটা সরকারী প্রোগ্রামে একটা অন্য ম্যানপাওয়ার যোগ করেছিলাম। সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন। তাঁরা ডেডিকেটেড। তাঁদের এই ডেভেলপমেন্টের কাজ করার অভিজ্ঞতা এবং এক্সপার্টাইজ রয়েছে, দিনের পর দিন করছেন এই কাজ। সব থেকে বড় কথা তারা কমিউনিটি বেস অর্গানাইজেশন, মানে সেল্ফ হেল্প অর্গানাইজেশন মানে গ্রামের দিদিদের কাছে এই সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশনের অ্যাকসেস এবং এক্সেপটেবিলিটি খুব ভালো। পঞ্চায়েত অনেক সময় এসএইচজিকে ব্যবহার করে, স্বীকৃতি দেয়, কিন্তু পঞ্চায়েত হচ্ছে বিগব্রাদার। এই অ্যাটিটিউড পঞ্চায়েতের সবসময় থাকে। এসএইচজিরা তাদের কাছে গ্রহীতার জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। ফলে পঞ্চায়েত কখনোই এসএইচজিকে অর্গানিক্যালি তাদের অংশ হিসেবে মেনে নেয়নি বা ভাবেনি। এসএইচজিরাও দেখছে পঞ্চায়েতের সঙ্গে থেকে তাদের খুব একটা কিছু ঘটেনি, ফলে এসএইচজিদেরও পঞ্চায়েতের সঙ্গে অর্গানিক্যালি যুক্ত থাকার ইচ্ছা হয়নি। যুক্ত হয়নি। ওরাও বুঝেছে পঞ্চায়েতের সঙ্গে যুক্ত হলে তাদের কাজে খবরদারি বাড়বে। ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আবার পঞ্চায়েতের লোকজনের স্ত্রী বা ঘরের অন্য মহিলা এসএইচজিতে রয়েছেন। সেসব জায়গা একটু আলাদারকম। কিন্তু সাধারণভাবে এসএইচজির মহিলারা পঞ্চায়েত থেকে দূরত্বই বজায় রাখেন। আবার পঞ্চায়েত ডাকলে তাঁরা গেছেন। সাপোর্ট চাইলে সাপোর্ট দিয়েছেন।

কিন্তু সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশনের সঙ্গে দিদিদের ইন্ট্রিগ্রাল রিলেশন আছে। তাঁরা দিদিদের একজন হয়ে সিস্টেমটার মধ্যে ঢুকেছেন। এবং দিদিরা ভাই হিসেবে, দাদা বা বোন হিসেবে মেনেও নেন। ফলে সিভিল সোসাইটির 'কমিউনিটি রিচ' বেশী, সরকারী আধিকারিকদের সেটা যথেষ্ট পরিমানে কম, এবং পঞ্চায়েতের বিভিন্ন কারণে কমিউনিটির সঙ্গে ডিলিংক্টড তৈরি হয়ে গেছে। ফলে এই ব্রীজটা সিভিল সোসাইটির দ্বারা হয়েছে। মানে কমিউনিটি পার্টিসিপেশনটা এনশিওর হয়েছে।

এরপর হচ্ছে ডোমেন নলেজটা। মানে ওয়াটার শেডের কাজ করার জন্যে যে ডোমেন নলেজটা দরকার, সেটাও সিভিল সোসাইটি সংগঠনের অনেক বেশী। এগ্রিকালচার

দপ্তর, জলসম্পদ বিকাশ দপ্তর, মাইনর ইরিগেশন এই সরকারী দপ্তরগুলোর কিছুটা ওই নলেজ আছে। আর কিছুটা ফরেস্ট দপ্তরে, যেহেতু তারা ফরেস্টের মধ্যেই কাজটা করে। কৃষিতে শুধু কিছু বীজ দিলাম, সার দিলাম, কৃষকরা চাষ করল, কৃষি বিষয়টাতো তা নয়। মাটি নিয়ে, জমি নিয়ে, জল নিয়ে কাজ করতে হয়। অথচ জল জমি নিয়ে কৃষি দপ্তরের তেমন মাথাব্যথা নেই। ফলে সার বীজ কীটনাশকের বাইরে কৃষিদপ্তর বের হতে পারেনি। বড়জোর কিছু ডিমনস্ট্রেশন প্লট তৈরি করেছে। কিছু নতুন ভ্যারাইটি হয়তো তাদের গবেষণায় এসেছে। সেগুলো ডিমনস্ট্রেট প্রোপাগেশন করেছে। কৃষিদপ্তরের সামগ্রিকতায় ঘাটতি আছে। ফলে একটা জলবিভাজিকা উন্নয়নের কথা যখন বলছি, তখন এই পার্টিকুলার ডোমেইনটায়, সেখানে ওই বিষয়টায় 'বিষয়-জ্ঞান' আমি সিভিলসোসাইটি অর্গানাইজেশন বা এনজিওর কাছে পেয়েছি।

তাহলে তার বিষয়বস্তুর জ্ঞান আর কমিউনিটি মবিলাইজেসনের ক্ষমতা এই দুটোকে জুড়ে দিয়ে তারসঙ্গে সরকারের অর্থকে জুড়ে দিলে ভাল কাজ হয়, সেটা সাসটেইনেবল হয়। এনআরইজিএর অর্থ প্রায় আনলিমিটেড। গত দুবছর কেন্দ্র রাজ্য সরকারের মধ্যে কোনো একটা গ্যাপ হয়েছে তাই এনআরইজিএ বন্ধ আছে। কিন্তু এটা যখন ঠিকমতন চলছিল, এই সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন আর সরকারী অর্থ জুড়ে দিতে একটা উইন উইন সিজুয়েশন তৈরি হল। কাজটা সাসটেইনেবেলিটির লক্ষ্যে এগিয়ে গেল।

কিন্তু সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশনগুলো সবাই যে খুব ভালোভাবে কাজ করেন এমন নাও হতে পারে। কিছু আছেন যাঁরা এখান থেকে ওখান থেকে ফান্ড যোগাড় করেন। তারপরে কী করেন আমরা জানিনা। তাদের ট্রান্সপ্যারেনসীর সমস্যা আছে এটা সরকারী এবং পঞ্চায়েত সদস্যরা মনে করেন। তার সবটা যে ভুল তাও নয়। কারণ ইম্প্রেসনতো বাস্তবতার উপরে অনেকটাই গড়ে ওঠে। আরেকটা কথা না বললেই নয়। সিএসওদের রিচ টা খুব কনসেনট্রেটেড। যেখানে করছেন সেখানে ইনটেনসিভলি করছেন। কিন্তু তার একসপ্যানসনটা অনেক কম। বড় জায়গা নিয়ে সিএসও বা এনজিওরা কাজ করেন না। এনজিও ছোটো ছোটো জায়গায় কিছু খুব ভালো মডেল ডেভেলপ করেন। যাঁরা ভালো কাজ করেন তাঁদের কথা বলছি। তাঁরা ছোটো করে মডেল ডেভেলপ করেন। সরকারের সঙ্গে সেই সংযোগ থাকে না। ওঁদের রিসোর্স সবসময় লিমিটেড। ওই লিমিটেড রিসোর্স নিয়ে তাঁরা বড় জায়গায় যান না। ফলে ওটাও আরেক ধরনের বিচ্ছিন্ন দ্বীপ তৈরি হয়ে যায়। একটা 'ভালো পাহাড়' তৈরি হয়েছে। শয়ে শয়ে যে পাহাড় আছে সেগুলোকে সবুজ করে দেব, এই জায়গাটা সিএসওদের পক্ষে সম্ভব নয়। তার কারণ রিসোর্স লিমিটেড।

সিএসওর এই যে ডেডিকেসন, ডোমেইন নলেজ বা বিষয়ের জ্ঞান, তাদের কমিউনিটি সংযোগ, লেগে থাকার মানসিকতা, তার সঙ্গে সরকারী রিসোর্সটাকে জুড়ে দিতে পারলেই একটা ব্যাপক পরিবর্তন আনা সম্ভব। সেটা আমরা 'ঊষর মুক্তি' প্রোগ্রামে পশ্চিমের জেলাগুলোতে দেখতে পেয়েছি।

যাই হোক, আমি আবার দার্জিলিং পাহাড়ের ঘটনায় ফিরে যাই। উঁচু জমি যাকে টাঁড় জমি বলে, মানে একদম উপরের অঞ্চলটা, তাকেই বলে টাঁড় জমি, পরের মধ্যবর্তী উচু অংশটা হচ্ছে বাইদ, তারপরের অংশটা কানারি, নীচের দিকে কিন্তু পুরোপুরি নীচে নয়। আরো নীচেরটা সব থেকে ভালো ফসলের এলাকা যেটা নীচে, সেটা হচ্ছে বহাল বা শোল। কেউ বলে বহাল কেউ বলে শোল। সেই জমিটা জলের কাছাকাছি। পয়সা অলা লোক বা মাস্টারমশাই, রাজনীতিতে শক্তিশালী, কোনভাবে প্রভাবশালি, তাদের জমিগুলো থাকে শোল বা বহাল অঞ্চলে। একেবারে গরীবমানুষদের জমিগুলো থাকে সব থেকে উঁচুতে। পুরুলিয়া বাঁকুড়ায় অনেক পাহাড় ব্যক্তিমালিকানায় রয়েছে, সেটা পয়সাওলা লোকেরই। প্রচুর জমি, পড়ে থাকে। কোনো সময় তারা কিনেছিল। তারমানে গরীবদের জন্যে কাজ করতে হলে সেই টাঁড় উচু জমি থেকে ট্রিটমেন্ট শুরু করতে হবে। যেভাবে আমরা ওয়াটার শেডের কাজ করতাম। আগেই বলেছি একটা স্প্রিং মানে একটা জায়গায় জল রিচার্জ হয়। একটা জায়গায় ডিসচার্জ হয়। মানে একটা জায়গায় জল পাওয়া যায়, আরেকটা জায়গা দিয়ে জল বেরিয়ে আসে। এক্ষেত্রে রিচার্জ এর জায়গা হচ্ছে টাঁড়। পাহাড়ে দেখা গেল একটা ঝরনা। সেই জায়গাটা আছে নীচে। তার রিচার্জ এরিয়া এমনকি তারচেয়েও নীচে। মানে পাহাড়ের ঝরনার রিচার্জ এরিয়া ঝরনার নীচে হতে পারে। সমান্তরাল হতে পারে, উপরের টাঁড়েও হতে পারে। কোথায় রিচার্জ এটা খুব ইন্টারেসটিং। একটা ঝোড়া বা স্প্রিং, মাটির নীচ থেকে জলটা গলগল করে বেরিয়ে আসছে, এর রিচার্জ যে কেবল উপর দিকে হচেছ তা নাও হতে পারে। আসলে পাহাড়ে প্রচুর ফিসার আছে। সেই ফিসার দিয়ে জল ঢোকে বা বের হয়। যেগুলো জল বেরুবার ফিসার নয়, জল ঢোকার ফিসার, সেগুলো যেখানেই লোকেটেড হোক না কেন, শিলার মধ্যে দিয়ে মধ্যে দিয়ে গিয়ে আবার যেখান থেকে বেরোয় সেখানে চলে আসে। বৃষ্টির জলের ঝরনা যেটা উপর দিয়ে বয়ে যায়, সেটা ধরে রাখা কঠিন, সবটা ইউটিলাইজ করা যায় না। বিশাল বিশাল জলাশয় তৈরি করতে হয়, পাহাড়ে তেমন জলাশয় তৈরির সুযোগ কম। জল ধরে রাখার জায়গাটা আন্ডারগ্রাউন্ড। পাহাড়েও। বৃষ্টির জলটাওতো আন্ডারগ্রাউন্ডে ঢুকছে। পাহাড়ের ফাটল দিয়ে ঢোকে। বর্ষার জলটা অধিকাংশই ওয়েস্টেজ। কারণ আমাদের দেশে খুব কম দিনে প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টি হয়। সারাবছর হয় না। দুটো সিজনে হয় বর্ষা ঢুকছে আর বেরুচ্ছে যখন, এটা ঘটে কেরালায়। আমাদেরতো হঠাৎ একসঙ্গে অনেকটা বৃষ্টি হয়, এই জলটা আমরা কোথাও ধরে রাখিনা, ড্যাম করে লাভ হয় না। একটা ড্যাম হবে। জল ছেড়ে দিতে হয়। প্রকৃতিও এই বাঁধ দিয়ে তার নিজস্ব ছন্দ নষ্ট করে দেওয়াটা পছন্দ করে না, ফলে এসব ড্যাম খুব একটা কাজে আসে না। বরং এই ড্যামগুলোর ফলে প্রচুর মানুষ উৎখাত হয়। তিস্তার আজকে কী অবস্থা? যে তিস্তা আগে একটা তন্নী রমনীর মত, একটা কিশোরীর মত ছুটে যেত, সেই তিস্তা আজকে পৃথুলা রমনীর মত মন্থর। তার গতি নেই, এদিক ওদিক বাঁধ দিয়ে স্থির জলাশয় সে। প্রকৃতি এসব অ্যাকসেপ্ট করে না।

হিমালয়েও দেখেছি প্রকৃতি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, মানুষকে সেখান থেকে বের করে দিতে চেয়েছে।

যাইহোক বাংলার পশ্চিমাঞ্চলের ওয়াটার শেড এলাকা আর পাহাড়ের স্প্রিং শেড এলাকা দুটোর মধ্যে বেসিক তফাত হচ্ছে স্প্রিং শেডের রিচার্জ এলাকাগুলো আইডেনিফাই করা দরকার। ইট পাথরের কংক্রীটের জঙ্গল তৈরি হয়েছে পাহাড়ে। এখন আমাদের মূল জঙ্গল এলাকাগুলোয় ফিরে যেতে হবে। কিছু গাছ লাগাই, কিছু গর্ত খুড়ি, একেবারে খুব ছোট ছোটো বাঁধ হোক, মানে চেকড্যামের খুব ছোট মডেল। এর ফলে প্রায় সাড়ে চারশো স্প্রিং রিভাইভ করেছে। কালিম্পং-এ গ্রীষ্মকালে জলের হাহাকার চলে। বিশাল জ্যারিকেনে জল কিনে মানুষ বাড়িতে রেখে দেয়। তার মূল কারণ স্প্রিং শুকিয়ে গেছে। এইসব স্প্রিংগুলোর প্রচুর রিচার্জ এরিয়া চা বাগানের মধ্যে। সেখানে সহজে লোকজনকে কাজ করতে দেয় না। ফলে ওখানে কাজ করা যায় না। আর এক রিচার্জ এরিয়া হচ্ছে জঙ্গলে। সেটাও ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট। তারা খুব রক্ষণশীল। পঞ্চায়েতকে কাজ করতে দিতে চায় না। অথচ এই দুটো জায়গায় কাজ করা না গেলে স্প্রিং রিচার্জ করা যাবে না। দেখা যাচ্ছে সেই একই সমস্যা। সরকারী উন্নয়ন ব্যবস্থায় দপ্তরগুলোর পারস্পরিক সমন্বয় নেই। তাছাড়া একটা ভিসন থাকতে হয়। সেটা সবার মধ্যে শেয়ার হতে হয়। সবার মধ্যে ভিসনটা চাড়িয়ে যেতে হবে। সেই ঘটনা ঘটে না। হয়তো এন আরইজিএ একটা স্বপ্ন দেখেছে, সেটা অন্যান্য দপ্তরকেও দেখাতে হবে তো। হয়তো চেষ্টাও হয়েছে। সম্ভব হয়নি। ফলে ভিসনটা একপাক্ষিক থেকেছে। শেয়ারড ভিসন হলে কঠিন হত না। চা বাগানে যে এত প্রতিরোধ, কিন্তু কথা বলতে গিয়ে দেখেছি যে, যখন বুঝিয়েছি চা বাগানে ঝরনা রিচার্জ হলে শ্রমিকদের জলের জন্যে দুচার ঘণ্টা সময় চলে যায়, তারা চা বাগানেই জলটা পাবে। কারণ ডিসচার্জ এরিয়াও চা বাগানে অনেক আছে। বলেছি যে ওদের বাড়ির হাফ কিলোমিটারে ঝোড়া ছিল। সেটা শুকিয়ে গেছে, এক কিলোমিটার দূরেরটায় গেছে, সেটা শুকিয়ে যেতে দু কিলোমিটার, এভাবে এখন চার কিলোমিটার দূরে যাচ্ছে। আমরা কাজটা করতে পারলে সবগুলো ঝোড়া বা ঝরনা ফের সজীব হবে। এই ভিসনটা যখন দেখানো গেছে, অনেক চা বাগান এগিয়ে এসেছে। তারপর গোটা জিনিসটা নিয়ে লেগে থাকার মানুষের অভাবও থাকে। আর আধিকারিক পালটালে, মানে যারা বিষয়টা চালাচ্ছে, তারা বদলি হলে বা চলে গেলে ভিসন পালটে যায়।

সুতরাং দেখতে পাচ্ছি ভিসন শেয়ার না হওয়া, লোক বদলে যাওয়া, কর্মী বদলে যাওয়া, দপ্তরে সমন্বয় না থাকা এসবই সাসটেনেবেল ডেভেলপমেন্টের অন্তরায়।

সরকারী ক্ষেত্রে উন্নয়নের কাজটা প্রধানত ব্লক স্তরেই হয়। নানারকম বাধা বিঘ্ন থাকে কাজের জায়গায়। সেই বিঘ্ন বাধা কিন্তু সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশনেও থাকে। ধরা যাক জেলা পরিষদ থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত যদি একই রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকে, তাহলে যে সাপোর্টটা পেতে পারতাম, জেলাস্তরে অন্য রাজনৈতিক দল থাকার

ফলে সেটা পেতে সমস্যা হবে। এটা সর্বত্র হয়। কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য সরকারের মধ্যেও এই সমস্যা থাকে। হয় সময়মত টাকা পাওয়া যায় না বা একদম পাওয়াই যায় না। এই সমস্যাটা রাজ্য এবং জেলার মধ্যেও দেখেছি। রাজ্যে একটা দল ক্ষমতায় ছিল, জেলা পরিষদে বিরোধী দল। রাজ্য চাইছে জেলা পরিষদে যাতে কাজ না হয়। তাহলে রাজনৈতিক মদাদর্শের দ্বন্দ্বতে কাজ আটকে যায়। অসরকারী সংগঠনেও দেখেছি অর্থদাতা সংস্থার টাকা সময়মত আসেনা কিছু ক্ষেত্রে। তখন একইভাবে তাদেরও কাজে বিঘ্ন হয়।

১৯৭৮ সালে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পগুলি পঞ্চায়েতের মাধ্যমেই রূপায়ন হয়। মানে প্রায় আশি শতাংশ গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বারা, বাকী কুড়ি শতাংশ পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের কাজ হবে। এখন গ্রামপঞ্চায়েতের যারা সদস্য, তাদের মতাদর্শগত পার্থক্য, সততা এসব খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আমরা একবার গ্রাম পঞ্চায়েত গুলো ইন্সপেকশনের সিদ্ধান্ত নিই। ইন্সপেকশনে কিছু ত্রুটি ধরা পড়ল। সেই ত্রুটি এখনকার তুলনায় কিছুই নয়, একটা আট হাজার টাকার মত গড়মিল, সেটা নিয়ে হৈচৈ হল যে বিডিও সাহেব কেন ইন্সপেকশন করছেন। ঘটনাটা এসডিও জানলেন। তিনি ফের ইন্সপেকশন করলেন। গড়মিল বেড়ে আটচল্লিশ হাজার হল, তাদের বিরুদ্ধে এফআই আর হল। শেষ পর্যন্ত ফাইনাল রিপোর্টে জাজমেন্ট এল মিসরিপ্রেজেন্টেসন অফ ফ্যাক্টস। ফলে কেস থেকে ওই পঞ্চায়েত প্রধান বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক কেরিয়ার শেষ হয়ে গেছিল। আরেকটা ইন্সপেকশনে সেখানে রাজ্য এবং জেলার শাসকদলের পঞ্চায়েত। আমি সেই আটের দশকের কথাই বলছি। সেখানে ইন্সপেকশনেও অনেককিছু পাওয়া যায়। জেলা থেকে চিঠি এল যে টাকাতো মানুষের। সেই টাকা আটকে রাখা যায় না। ফলে পঞ্চায়ত সমিতির মিটিংএ টাকা ছেড়ে দিতে হল। বিডিও দুর্নীতি ধরলেও সেই বিডিওকে টাকা ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হল। বিডিও টাকা আটকেছিল, আর একটা চিঠি এল এসব ঠিক করোনি। ইন্টারনাল অডিট দুর্বল হবার ফলে দুর্নীতি হয়েছে। সিস্টেমের দুর্বলতায় দুর্নীতি হয়েছে। ভবিষ্যতে এরকম দুর্নীতি হলে তোমার বিরুদ্ধে অ্যাকসন নেব। মানে তুমি দুর্নীতি করেছো সেটা মেনে নিচ্ছি, কিন্তু আবার দুনীর্তি করলে তবে অ্যাকসন নেব। একজন অপেক্ষাকৃত নীচুতলার কর্মীকে দায়ি করে সতর্ক করা হল যে তোমার জন্যে এটা ঘটেছে। প্রশাসন কিন্তু সিস্টেম যেখানে ভুল ধরছে, সেখানে আরো সার্পোট দেবে— সেটা হয় না। জেলা প্রশাসনেও অনেকটাই শাসকদলের দ্বারা গাইডেড হয়, এই যে ঘটনাগুলো বলছি, এই সবই কিন্তু সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেসনেও ঘটবে যারা একটু বড় এনজিও। অনেক জেলায় শাখা, ম্যানেজার, প্রভৃতি আছে। কোটি কোটি টাকার কাজ করেন। তাঁদের আবার এইসব উদাহরণ থেকে শিক্ষাটা নিয়ে নিতে হবে। বিভিন্ন মতাবলম্বী কর্মী তাদেরও থাকে, সিস্টেমের দুর্বলতা থাকে। তৃতীয় একটা ক্ষেত্রে এরকম দুর্নীতি হল, আমি এফআইআর না করে জেলায় পাঠিয়ে দিয়ে বললাম তোমরা দেখো। তার ফলে আমার বিরুদ্ধে খুব

বড়ো রকম ডেপুটেশন দেয়া হল। সেই গত শতাব্দীর আশি দশকের শেষ দিকের ঘটনা বলছি। ওসব ডেপুটেশন টেপুটেশনতো আমাদের চাকরীর অঙ্গ। তৃতীয়টা রাজ্যের জেলার শাসকদলের বিরুদ্ধে গেছে। ফলে তারা ডেপুটেশন দেবেই। বিডিও বিরোধী দলের হয়ে কাজ করছে এরকম ইম্প্রেসনস তৈরির চেষ্টা হল।

কিন্তু দুটি রাজনৈতিক দলের এই যে তিনজন পৃথক পৃথক প্রধানের কথা বললাম, এই তিনজন প্রধান কিন্তু পরবর্তী সময় রাজনীতি থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। অর্থাৎ মানুষ কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোঝে। দুর্নীতিগুলো যখন বাইরে আসে। তাকে শেষ পর্যন্ত মানুষ কিন্তু মেনে নেয় না, এদের মধ্যে দুজন খুব দোর্দন্ডপ্রতাপ প্রধান ছিলেন, তাদের উপরদিকের নেতারাও বোঝেন বাইরে স্বীকার না করলেও ভেতরে ভেতরে বোঝেন যে তাকে সরিয়ে দেবার সময় এসেছে। এইসব ঘটনা থেকে বড় সিএসও গুলির ম্যানেজমেন্টকে শিখে নিতে হবে। দুর্নীতি কিন্তু চাপা থাকে না বেশিদিন। সে প্রকাশিত হবেই, হবেই, হবেই;।

আমরা সরকারী অফিসাররা সিস্টেমের ধারক বাহক। মনে রাখতে হবে, এখানে সিস্টেম বলতে একটা কম্পিউটার নয়। এখনকার ছেলেমেয়েরা কম্পিউটারে বসে থাকাকে বলে আপনি সিস্টেমে আছেন? সিস্টেমের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, যে ব্যবস্থাপনার মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠানটা চলছে, সেই গোটা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনাটাই হচ্ছে সিস্টেম। যারা কম্পিউটারের সামনে বসে কাজ করাটাকে সিস্টেমে বসে থাকা বলেন, শিক্ষার সম্পূর্ণতা না থাকার কারণেই তারা এসব শব্দ ব্যবহার করেন। আমাদের সরকারী ক্ষেত্রে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সিস্টেমের অংশ, কম্পিউটার নিজে সিস্টেম নয়, সিস্টেমে অতি ক্ষুদ্র একটা যন্ত্র মাত্র। দুই হচ্ছে যাঁরা চাকরি পেয়ে আমাদের মত আসছেন, তাঁরাও সিস্টেমটা পরিচালনা করছেন মানে সিস্টেমের অংশ। সিস্টেমের যেটা মূল অংশ, সেই মানুষ কিন্তু এই সিস্টেমের মধ্যে কোনোদিনই ঢুকতে পারেন না। যাঁদেরকে নিয়ে যাঁদের জন্যে প্রতিষ্ঠান চলে, প্রতিষ্ঠানে তাঁদের ভূমিকা সবচেয়ে কম। মানুষের দায়িত্ব প্রতিনিধি নির্বাচন করে দেওয়া পর্যন্ত। একবার প্রতিনিধি নির্বাচন হয়ে যাবার পর সাধারণ মানুষের কথা বলার জায়গাটা খুবই সীমিত। সে আমি গ্রামসংসদ বলি বা অ্যাসেমব্লি, কিংবা পার্লামেন্টের কথাই বলি। সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের জায়গায় চিরকাল ঘাটতি থেকে গেছে। সেটা অসরকারী সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশনেও সত্য। ক্ষমতা হাতে থাকলে সবাই তার কথাই শেষ কথা বলে মনে করে। তখন সে জনগণতো ছাড়, নিজেদের কর্মীদের কথাও শোনে না, একটা সুবিধাভোগি শ্রেনীও সিস্টেমের মধ্যেই তৈরি হয়।

অথচ প্রশাসনে বা অন্যান্য বিশেষজ্ঞ ক্ষেত্রে যাঁরা কাজ করতে আসছেন, তাঁরাও অনেক স্বপ্ন নিয়ে কাজ করতে আসেন। তারা যখন চোখের সামনে দেখতে পান যে শাসন করছেন যে কর্তৃপক্ষ, তাদের কাছ থেকেই সব থেকে বেশি বাধা আসবে, তখন তাদের মধ্যে গোটা সিস্টেমের প্রতি একটা নির্মোহ ভাব চলে আসে। তারা তখন সিস্টেমের বিরোধীতা করেন বা সিস্টেমের বিরোধিতা হচ্ছে এটা দেখলে তারা খুশি হয়ে যায়। এই

ঘটনাটাও সরকারী অসরকারী দুধরনের প্রতিষ্ঠানেই ঘটে। এটা আমি নির্বাচন কমিশনের চীফ ইলেকশন অফিসার (সিইও) হিসেবে কাজ করেছি ২০১১ সালে, সেখানেও আমি দেখেছি অফিসারদের মধ্যে এ্যান্টি এসট্যাবলিশমেন্ট মানসিকতা। অফিসারদের মধ্যে যারা মাঠে ঘাটে মানুষের কাছে গিয়ে কাজ করেন, তাঁদের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে একটা মানসিকতা কাজ করে। এবং সেটা অসরকারী, সরকারী, সবক্ষেত্রেই ঘটে। কারণ মানুষের কাছে যাবার যে উদ্যোগ, সেই উদ্যোগটা ধাক্কা খায়।

আবার সব প্রশাসনেই কতো পরিমান কাজ হচ্ছে সেটাকেই গুরুত্ব দেয়া হয়। বার বার প্রশ্ন করা হয় কতদিন কাজ দেয়া গেছে, কত মানুষ কাজ পেয়েছে, সেসবও বারংবার জিজ্ঞেস করা হয়, সেখানে কাজের কোয়ালিটি গুরুত্ব পায় না। এই কোয়ালিটিটেডিভ বা পরিমান গত তথ্য পরিসংখ্যানটাতে কর্পোরেট থেকে সরকার সকলেই বেশি গুরুত্ব দেয়, কোয়ালিটি যা খুশি হোক, ম্যাসেজ পরিস্কার যে তোমাকে যেভাবে হোক কাজের গড়টা বাড়াতে হবে। উপরের দিকের কর্মী যারা জেলাস্তরে, তারা খুব চাপে থাকে। কর্তৃপক্ষের সাথে কমপ্লায়েন্স করেই চলেন, না করলেতো টিকতে পারবেন না। যাদের টিকে থাকার দায় নেই, তারা সেটা করবেন না। এই ঘটনাটাও সরকারী, বেসরকারী, অসরকারী সব ক্ষেত্রেই ফিল্ডে কাজ করাটা বেশ কঠিন এবং যতদিন যাচ্ছে কঠিন হয়ে উঠছে।

আসলে ব্যুরোক্রাসিহোক আর যে ক্র্যাসিই হোক, আলিটিমেটলি সবাই মানুষ। তাদের সকলের বিভিন্নরকমারি মানসিকতা, বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাবার প্রচেষ্টা থাকে, নীতি দুর্নীতির প্রসঙ্গ থাকে। কে কীভাবে প্রেসারটা নেবেন আর প্রেসারটাকেই আরেকটা সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করবেন এই সবকিছুর উপর নির্ভর করবে। যারা মেরুদণ্ড সোজা রেখে কাজ করতে চায়, তারা প্রতিষ্ঠান বিরোধী বলে চিহ্নিত হয়, সর্বত্র হয়। বেসরকারী কর্পোরেট, অসরকারী, সিভিলসোসাইটি অর্গানাইজেশন সব প্রতিষ্ঠানেই এগুলো ঘটছে, কারণ শেষ পর্যন্ত সবাই মানুষ এবং মানুষ দিয়েই মানুষের কাজ করতে হবে। এসব বিষয় তাই হয়তো পৃথিবীর সব দেশেই সত্য। কোনো এলাকায় কোনটা দরকার বেশি জানে সেখানকার জনগন। তাদের অংশগ্রহণ নেই। উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া কিছু স্কিম ইমপ্লিমেন্ট হয়, পঞ্চায়েত বা সিভিল সোসাইটি অর্গ্যানাইজেশন হচ্ছে সেই স্কিম ইমপ্লিমেন্টেসনের একটা টুল। এটাতো হবার কথা ছিল না। সুতরাং সুস্থায়ী উন্নয়ন কতকগুলি স্কিম ইমপ্লিমেন্টে দিয়ে হয় না। এত লোককে জব কার্ড দেবার দরকার ছিল না। সবাই এনআরই জিএর কাজ করতে যাবেও না। জবের গ্যারান্টিতো যাদের প্রয়োজন শুধু তাদের কথা ভেবেই দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সেটা হলে জবকার্ড জমা রেখে যা যা করা সম্ভব সেটা আবার করা যায় না। সারা দেশেই এই অবস্থা। সেখানে সুস্থায়ী উন্নয়ন কীভাবে, কবে হবে, কেনই বা হবে সেটা শুধু অলমাইটির হাতে হয়তো রয়েছে। □

সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট ডায়নামিক কনসেপ্ট, এর কোনো ফর্মূলা নেই

কৃত্তিকা সিমলাই, সোসাল এ্যাকটিভিস্টি

সাসটেইনেবেল বলতে, আমি আজ যেটা ভাবছি ভাল হবে বলে, আমার পরিবারে কিংবা সামাজিক ক্ষেত্রে সেটা আগামী দশ বছর যাতে থাকতে পারে, সেই জায়গায় নিয়ে যেতে হবে। ধরাযাক আরও দশ বছর আমি বাঁচবো, সেই দশ বছর আমাকে অনুশীলনটা চালিয়ে যেতে হবে, যাতে আমার চারপাশের লোকজন আমার ওই অনুশীলনটা লক্ষ্য করে মনে করে আমি ঠিক কাজ করেছি। তারা গ্রহণ করবে। ঠিক নয় মনে করলে তারা নেবে না। আমার কাছে সাসটেইনেবেল মানে দশ বছর দশ বছর করেই ভাবাটা ভালো। দশ বছর পরে যদি আমি বেঁচে থাকি আমি আবার কন্টিনিউ করবো। আমি মনে করি, আজকে আমি কিছু একটা কাজ করলাম, কালকে সেটা শেষ হয়ে গেল মানে সেটা সাসটেইনেবেল নয়। আমার পরের প্রজন্মও সেটা নিতে পারছে, কিংবা তারও পরের প্রজন্ম নিতে পারছে, সেটাই সাসটেইনেবিলিটি। একটা সাইকেল বা চক্রাবর্ত তৈরী করে দেওয়া, যেরকম পৃথিবী চক্রাবর্ত নিয়মে চলছে। মানে বিশ্বপ্রকৃতির কথা বলছি। সূর্য উঠছে বলে জল বাষ্পীভূত হচ্ছে, বৃষ্টি হচ্ছে, মাটিতে জল শোষণ হচ্ছে। গাছ আবার সেই জল নিচ্ছে মাটির তলা থেকে এই নিয়মটা হচ্ছে একটা চক্রাবর্ত বা সাইকেল। পৃথিবী ভারাক্রান্ত হলেও সুনামী হয় বা অন্য কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘনিয়ে উঠছে। পৃথিবী সেই ভারলাঘব করার জন্যে এটা ঘটাচ্ছে। আমাদের কাছে সেটা দুর্যোগ মনে হলেও প্রকৃতির জন্যে সেটা

প্রয়োজন বলেই প্রকৃতি ঘটাচ্ছে। সেই ন্যাচারাল প্র্যাকটিসটা আনতে হবে।

মানুষের পেট কিন্তু টাকাতেও ভরবে না, কম্পিউটারেও ভরবে না। মানুষ খাদ্য উৎপাদন করতে পারলে তার পেট ভরবে। আমি একটি জায়গায় শাকসব্জি ফলমূল উৎপাদন করলাম, তাই দিয়ে খাওয়া হল। বাজার থেকে কিনতে হলো না। আমার সেই টাকাটা সাশ্রয় হল। এই সাশ্রয়টাও আমার ইনকাম। এইটা হচ্ছে ন্যাচারাল সাসটেইনেবিলিটি। প্রযুক্তি হয়তো দুনিয়াটাকে একজায়গায় হাতের মুঠোয় এনে দিচ্ছে। আফ্রিকার মানুষ কতো কষ্ট করে বাঁচে। সেটা দেখতে পাই না। একজন যদি আমাকে তার কষ্টের কথা বলে, আমি বললাম সঙ্গে সঙ্গে যে তোমার আর কী কষ্ট। আমারও এই কষ্ট। তাকে তার কষ্টের জন্যে আমি সাহায্য সহযোগিতা না করে, তোমার কষ্টটা খুব একটা কষ্ট নয়, আমার কষ্ট অনেক বড় বলে নিজের বিজ্ঞাপন দিতে থাকি। আফ্রিকার ওই মানুষগুলি যেভাবে বাঁচে, প্রযুক্তির মাধ্যমে সেটা জানতে পারছি শুধু, কীভাবে তারা তাদের সমস্যা উতরে যাচ্ছে, কষ্টটা অতিক্রম করছে, সেটা নিই না। সাসটেইনেবিলিটি আসছে না সেইজন্যে। স্বাভাবিক বা ন্যাচারালভাবে যা করা দরকার সেটা যখন করা হবে, সাসটেইনেবিলিটি আসবে। মানুষের মনোজগৎ থেকে ওটা উদাহরণ দিয়েছি। অন্যের দুঃখকষ্টের কথা শুনে তাকে সাহায্য করতে ইচ্ছা হবে। সেটাই ছিল ন্যাচারাল। তার বদলে তাকে ছোট করে তক্ষুনি নিজের কষ্টের বিজ্ঞাপন দেওয়াটা ন্যাচারাল নয়। নর্ম্যাল নয়। সেটা এ্যাবনর্ম্যাল। জীবনের সবক্ষেত্রেই আমাদের প্রক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া, ক্রিয়া সবটা ন্যাচারাল হলে ভাল হবে। যেভাবে পশুপাখিরা বাঁচছে। আমরাও তাদের মতই একটা এ্যানিমেল। সেই এ্যানিমেল ইন্সটিংক্টটা আমরা কাজে লাগাচ্ছি না। সেটা কাজে লাগালে প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মেই অন্যদের সাহায্য করা, সহযোগিতা করা সম্ভব। প্রকৃতির অন্য প্রাণীরা দেখা যাবে বনের বলবান পশু একটা বাঘ, সে দুর্বল হরিণকে খায়। কিন্তু বাঘের পেটভর্তি থাকলে মুখের সামনে হরিণ থাকলেও অকারণ বাঘ হরিণকে মারবে না। এটাই হচ্ছে ন্যাচারাল। মানুষের কিন্তু পেট ভর্তি থাকলেও নিতান্ত লোভের কারণে সে আরো চাইবে, এইখানে মানুষ ন্যাচারাল ইন্সটিংক্ট থেকে বেরিয়ে কৃত্রিম হয়ে যাচ্ছে। নিজে ভালভাবে আছি ঠিকাছে, বাকীরাও কীভাবে ভাল থাকতে পারে সেটা ভাবতেই হবে। তার বদলে, নিজেরই ভালো, আরো ভালো আরও ভালো চাইবো, এরতো শেষ নেই। সেটাই লোভ। তখনি সে অন্যকে শোষণ করবে, ঠকাবে। সবটাই সে শুধু নিজের জন্যে ভাবছে। মানুষের বিবেক, মানবিকতা এসব হচ্ছে কতকগুলো ইমোসন বা আবেগ, অন্যান্য প্রাণীরও থাকে। হাতী তার নিজস্ব ভাষায় তার ইমোসন প্রকাশ করে। আমরা মানুষেরা নিজেদের ইমোসনের নাম দিয়েছি, ওরা নাম দেয়নি হয়তো। দিলেও সেটা তাদের ভাষায়, আচরণে তারা প্রকাশ করে। কুকুর ঘোড়া হাতীর এসব আবেগ আমরা অনেকটা বুঝতে পারি। এ্যানিমেল সোসিওলজি বলে একটা বিষয় আছে, বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সেটা পড়ানো হয়। দেখা যাবে, অন্যান্য প্রাণী তাদের এ্যানিমেল ইন্সটিংক্ট-এর বাইরে কিছু

আচরণ করছে না। মানুষ তার এ্যানিমেল ইন্সটিংক্ট-এর বাইরেই বেশীরভাগ আচরণ করছে। এখানেই সে নিজের সাসটেইনেবিলিটি নিজেই আটকে দিচ্ছে। আমরা কী করছি? নিজের জায়গাটা ঠিক রাখতে গিয়ে গাছপালা কেটে জলাভূমি বুজিয়ে, পশুপাখিকে হত্যা করে তাদের উপর অত্যাচার করে আমি নিজেইতো বাঁচবো না। যেটা বলতে চাইছি, যে আজকে যেরকমভাবে বাঁচছি, সেইরকমভাবে বা আরও ভালোভাবে যদি বাঁচতে চাই দশ বছর পরে, তাহলে আমাকে সেইরকমভাবে স্টেপস নিতে হবে। সেই স্টেপগুলি নেওয়াটাই সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্টের অভিমুখে যাত্রা করা। যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা যায়। সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে নিজের শরীর ঠিক রাখার জন্য যা করার করবো, কাজে গেলাম যাতে আমার প্রজেক্টটা ঠিকঠাক ভাবে চলে, আমার অনুপস্থিতিতেও যাতে সব ঠিকঠাক চলে সেরকমভাবে কাজ করলাম। একটা পরিকাঠামো তৈরী করলাম। তারপর আমার পরিবারের খেয়াল রাখার চেষ্টা করলাম। টাকাপয়সা সঞ্চয় করলাম। শরীর স্বাস্থ্য ঠিক রাখার ব্যবস্থা করলাম। মানসিক সুস্থতার জন্যে বিনোদনের ব্যবস্থা করলাম। আমি যেহেতু সহরে রয়েছি। এইটা আমার লাইফস্টাইল হল। সেইরকম আমরা যাদের সঙ্গে কাজ করি চাষীভাই বা বোনদের সাথে। তারাও সকালে ঘুম থেকে উঠে সব্জী চাষ, মাছ চাষ, ধান চাষ নিয়ে যা যা করে, সেটা যেন সুষ্ঠুভাবে করতে পারে, সেটা না হয়ে রাজনৈতিক প্রভাব এলো। ওর চাষ করে যা উৎপাদন করলো, তার দাম যা হয়, সেটা সে পেলো না। সেইটা হচ্ছে ন্যাচারাল পদ্ধতির বাইরে গিয়ে কৃত্রিমভাবে একটা অন্যকিছুর সাহায্য নিয়ে জীবনের স্বাভাবিক ছন্দটাকে নষ্ট করে দেওয়া। বা ওরা সব্জি উৎপাদন করলো, কিন্তু পরিবহণ ব্যবস্থার অভাবে বাজারে নিয়ে যেতেই পারলো না। সেই সাহায্যটা তাকে করা দরকার যাতে জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ বা গতিটা বিঘ্নিত না হয়। আমরা তার থেকে বেশী সুযোগ পেয়েছি পড়াশোনা করার, এখন আমরা তাকে সাহায্য করবো। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেব। এইটা হচ্ছে স্বাভাবিক বা প্রকৃতির স্বাভাবিক নীতি। আর ওকে সাহায্য না করে ওর কষ্টার্জিত উৎপাদনটা ওর অসহায়তার সুযোগ নিয়ে আমি সস্তায় ওর থেকে কিনে একটু দূরে গিয়ে অনেক বেশী দামে বিক্রী করলাম। ও খেতে পেলো না। আমার বাড়িতে পাথর বসানো গেল এইটা স্বাভাবিক নয়। আমি যেমন আমার কাজটা বুঝি, তারাও তাদের সব কাজটাই জানে। এবার আমি যেটা জানি, সেটা যদি তার কোন কাজে লাগে, সেটা তাকে জানিয়ে আরেকটু এগিয়ে দিতে পারি মাত্র। একটা এ্যানিমেলকে ট্রেনিং দিয়ে অনেক কিছু কাজ করিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু সে যদি ট্রেনিং পাবার সুযোগ না পেতো, নিজেদের কমিউমিটিতে আবদ্ধ থাকতো, তার ওই দক্ষতাগুলো চাপা পড়েই থাকতো। সে জানতোই না সে গন্ধশুঁকে একজন খুনীকে ধরিয়ে দিতে পারে, চোর ধরতে পারে। অথচ ক্ষমতাটা তার মধ্যেই ছিল, ট্রেনিং দিয়ে তার মধ্যেকার ঘুমন্ত শক্তিটা আমরা জাগিয়ে দিচ্ছি। সব মানুষকে হয়তো জাগানো যায় না, তাদের নিজস্ব প্রেচষ্টা থাকে না। যাদের নিজস্ব প্রচেষ্টা

থাকে, উদ্যোগ থাকে, তাদের মধ্যে এই শক্তিটা জাগানো যায়।

এখন সোসাল সেক্টরে কাজ করছি। সাইটেইনেবিলিট নিয়ে ভাবছি। কিন্তু যখন একা থাকি, ভারতীয় দর্শনের কথা মনে হয়। যার সৃষ্টি আছে, তার ধবংস অবশ্যম্ভাবী। মনে হয় সবইতো মায়া, যা কখন থাকবে, কখন থাকবে না। আমার হাতেও নেই। আমি যত কাজই করে যাই না কেন, যে যেটা করার সে সেটাই করবে। সেইজন্যে শুরুতেই আমি দশ বছরের প্রকল্পের কথা বলছি। শঙ্করাচার্য যে বলেছেন। নাস্তি ধন জন যৌবন গর্বম, হরতি নিমেষাৎ কালৌ সর্বম--- এটাতো অস্বীকার করা যাবে না। ব্রহ্মান্ডে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। তাই যদি দশবছর বেঁচে থাকি তো সেই সময়টুকুর জন্যেই প্রকল্প করি।

জাতিসংঘ পনেরো বছরের পরিকল্পনা করেছে। ২০১৫ থেকে ২০৩০। আমাদের স্ট্র্যাটেজি হল ২০২৭ অব্দি। তাহলে সবাই একটা বাঁধা টাইম দিচ্ছে। ধরে নিচ্ছে অতগুলো বছর তারা বাঁচবে। আমি দশ বছর বাঁচি যদি, লোন টোন মেটাতে হবে। বাবা মাকে দেখতে হবে। যেভাবেই হোক দশটা বছর বাঁচতে হবে। আমার কাছে তাই ডেভেলপমেন্ট মানে দশ বছরের এক একটা টাইম ফ্রেমের মধ্যে। মানুষকে সঞ্চয় করতে হবে। আমার মতে এই সঞ্চয় করার ধারণাও এ্যানিমেল ইন্সটিংক্ট। ভাল্লুক সঞ্চয় করে। মৌমাছি সঞ্চয় করে। পিঁপড়েও সঞ্চয় করে। অনেক প্রাণীর থেকে কিছু কিছু নিয়ে মানুষের মাল্টিসেক্টরাল অর্গ্যানিজম্। জেদ, রাগ, ভাংচুর, ভালবাসা সব রয়েছে। আমরা যারা পড়াশোনা করছি, হাতে সময় রয়েছে, নানারকমভাবে জীবনকে নিয়ে ভাবছি। আজ যদি সময়টা আমাদের না থাকতো, দিন আনা দিন খাওয়া মানুষের মত, তাদের কিন্তু অতো ভাবার সময় নেই।

তাদের হচ্ছে আজকের খাবারটা যোগার করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু রবীন্দ্রনাথ হয়েছিলেন ওনাকে ভাতের চিন্তাটা করতে হয়নি। যাদের ভাতের চিন্তা নেই, তাদের মস্তিষ্ককে ব্যাস্ত রাখার জন্যেই এত দর্শন, ধর্ম, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সাহিত্য, সঙ্গীত সৃষ্টি হয়েছে তাদের দ্বারাই যাদের অভাব নেই হাতে সময় আছে। যাদের ভাতের অভাব আছে, তাঁরা বলেন, আপনারা আসছেন, আমাদের ভালো লাগছে। আমরা গরীব। দিদি ছিলেন, পাপিয়াদি তখন বললেন, "আপনারা গরীব নন। আপনারা সম্পদের মাঝে বসে আছেন।"

গঙ্গাসাগরে গ্রামের মানুষের সাথে কথা বলছিলাম। ওরা নিজেরাই জানেনা তারা সম্পদশালী। গাছ থেকে ফল পাচ্ছে, পুকুরে মাছ আছে, চাষের শষ্য আছে। আমাদের বাড়িতে যদি অতিথি আসে, আমার বাবাকে জামাকাপড় বদলে মিষ্টির দোকানে ছুটতে হবে। কারণ আমাদের সেই সম্পদ নেই। বাইরে থেকে নিয়ে আসতে হবে। ওরা ওদের সঞ্চ য় থেকে কিছু দিয়ে অতিথি আপ্যায়ন করে। গাছ থেকে ডাব পেড়ে দেয়, ক্ষেতের তরমুজটা, গাছের আমটা কেটে দেয়। আর সেটাই সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট।

আমরা পড়াশোনা করছি, ভাবছি সেটাই ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করছি সোসাইটিকে। ডেভেলপমেন্টকে যদি আমরা মনে করি অগুনতি বছরের জন্য, সেটাও কিন্তু নয়।

পৃথিবীর যদি মনে হয় সে ধবংস হয়ে যাবে, সে ধবংস হয়ে যাবে। আবার একটা নতুন পৃথিবী হয়তো সৃষ্টি হবে। টাইম ইজ মোস্ট ডায়নামিক থিঙ্গ ইন দ্যা ওয়ার্ল্ড। নিজের গতিতে চলছে। আমরা যেটা ধরে রাখার চেষ্টা করছি সেটা দশ কুড়ি তিরিশ বছরের কাজ। সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট শুরু হবে আজ থেকে। আজ যদি ভালভাবে থাকি কালও যেন সেটা বজায় থাকে। আজ যদি ওই চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে পড়ি, তাহলে কাল আমাকে দেখে পার হতে হবে যে ওইখানে একটা চৌকাঠ আছে। আমি যাতে হোঁচট খেয়ে না পড়ি, আমার মস্তিষ্ককে সেইভাবে তৈরী করব যাতে ভুলগুলোর রিপিটেসন না হয়। ভুলের রিপিটেসন মানে সেটা অন্যায়। ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। যেটা আমি আজকে করছি, ভাল করছি, সেটা যাতে কালও করতে পারি, কিছু বছর ধরে করে যেতে পারি। সেটাই আমার কাছে সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট।

সমাজকল্যাণ মানে আমি সবার কল্যাণ করতে পারবো, সবার সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট করতে পারবো তাও নয়। আমরা সমাজকর্মী হিসেবে অনেকসময় মনে করি সবার কল্যাণ করে ফেলবো। কিন্তু একশোভাগ দায়িত্ব আমার নয়। আমরা ভাবছি, ভাবার ইন্ধন পাচ্ছি। আমরা যাদের সঙ্গে কাজ করি, তাদের সেই ভাবনা চিন্তার সময়টা নেই। তাদের আমরা জোর করে বের করে এনে একটা মিটিং করাই। যাতে ওরা একটু ভাবে। ওদের সারাদিনের কাজকর্ম থেকে একটু সময় বের করে ওরাও যেন ভাবে। একজন সোসাল ওয়ার্কারের কাজ হচ্ছে মানুষের ভাবনার ডিরেকসনটা বদলানো। এইবার সেই ভাবনা কার বদলাবে, কতোটা বদলাবে, তার দায় পুরোটা আমাদের নয়।

এখন কথা হচ্ছে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্ক, সব বিষয়ের আধুনিকতম টেকনোলজি, বিলিয়নস্ ডলারের সঙ্গে আমাদের কর্মিদের এই অসম যুদ্ধ। আমাদের হাতে গরীবের টেকনোলজি যা ট্র্যাডিসনাল। ভিক্ষে করে পাওয়া সামান্য অর্থ। অপর দিকে যারা ডেভেলপমেন্টকে নিয়ন্ত্রণ করে, ভুল পথে চালনা করে, তাদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্ক। তাদের কেনা কলম। যা লিখতে বলবে, বিজ্ঞানীরা তাই লিখবে। আমরা কেনা মিডিয়া মারফৎ সেটুকুই জানবো। তাহলে সত্য উপলব্ধি কী করে হবে? সত্যই যেহেতু একমাত্র সাসটেইনেবেল, তার উপলব্ধিটা কী করে হবে? তারা ডেভলপমেন্টকে ডমিনেট করে। এখন দেখতে হবে, কর্পোরেটের লাভের একটা খুব ছোট অংশ হলেও কমিউনিটিতে ফেরৎ আসছে ডেভেলপমেন্টের জন্যে। তারা সেই টাকাটাও দিত না যদি ওই আইনটা গভর্নমেন্ট না তৈরী করতো। অন্যদিকে সরকারও এত ভারাক্রান্ত যে তারা কাজগুলো কর্পোরেট আর সিভিল সোসাইটি অর্গ্যানাইজেসনের মাধ্যমেই করার চেষ্টা করছে। মনে হতে পারে যে সি এস আর-এর টাকাটা আসলে টুথপেস্টের সঙ্গে একটা ফ্রী চামচ দেবার মত, যাতে টুথপেস্টটাই বেশী বিক্রি হয়। কিন্তু সেই চামচটাও প্লাস্টিকের দিচ্ছে না মাটির চামচ দিচ্ছে না স্টিলের চামচ সেটা তাদেরই

নির্দ্ধারণ করতে হবে। মাটির চামচ হলে সেটা সাসটেইনেবেল হবে। স্টীল হলে দশ বছর পরে নষ্ট হয়ে যাবে। মাটির চামচ হলে সেটা ঘুরে আরেকটা মাটির চামচ হয়ে ফেরত আসতে পারে।

এখন বাতাসের দূষণ, সমুদ্র জলের স্ফীতি এসব নতুন নয়। মানুষ বাতাসের দূষণ থেকে বাঁচতে নাকে হাত চাপা দিতে দিতে নাকের ফুটো নীচের দিকে হয়েছে। তার মানে বাতাসে ধুলোর দূষণ কত প্রাচীন। আর মহাপ্লাবনের গল্প বাইবেলে নোয়াজ আর্ক-এর কাহিনীতে আছে। হিন্দু মাইথোলজিতেও আছে। মেক্সিকোর মানুষের চোখের গড়ন মঙ্গোলিয়ানদের মতন। সূর্যের আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মির জন্যে চোখ কুঁচকে রাখতে রাখতে চোখের গড়ন পাল্টে গেছে। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে এইসব বায়ুদূষণ বা জলস্ফিতি এসব হাজার হাজার বছর আগেও ছিল। এখন কেনা কলম, কেনা মস্তিষ্ককে দিয়ে অনেক কথা বলিয়েও নেওয়া সম্ভব। পরিবেশ ধবংসের কথা বলে ভারতের মতন দেশের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণও করা যায়।

এই যে চ্যাটজিপিটি এসেছে, এগুলো সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে না। কারণ ওই জিনিসটা মাঠে গিয়ে চাষ করার কোনও কাজে লাগবে না। চাষতো ফোনে হয় না। চাষের জন্য মাঠে নামতে হবে। হাত ভেজাতে হবে, পা ভেজাতে হবে, বৃষ্টিতে ভিজতে হবে। চ্যাটজিপিটি মানুষের তৈরী একটা প্রোগ্র্যাম, সেটা মানুষ তৈরী করেছে। বাতাসের কার্বনডাই অক্সাইড থেকে সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে গাছ যেভাবে নিজের শক্তিটা বানায়, বিজ্ঞানী সেভাবে শক্তি তৈরী করছেন, সেটা চ্যাটজিপিটি পারবে না। এখন মানুষ তৈরী করার পর চ্যাটজিপিটি জানবে। তাহলে দেখতে পাচ্ছি মানুষ, অন্যান্য প্রাণী, গাছপালা এই সবই হচ্ছে সাসটেইনেবেল অস্তিত্ব। টেকনোলজি নয়। যেসব দেশের টেকনোলজি উন্নত, কিন্তু ভারতের মত প্রাণময় শক্তি এত নেই, তারা নানাভাবে চাইবে ডমিনেট করতে। আমেরিকা প্রভূত পরিমানে কার্বনডাই অক্সাইড তৈরি করবে। ব্রেজিল, ভারত নিজের দেশে জঙ্গল রেখে সেটা ব্যালেন্স করবে!

মুস্কিল হচ্ছে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার। একজন ছাত্র বা ছাত্রীর ভাল না লাগলেও অঙ্ক করতে হবে কিংবা ইতিহাস পড়তে হবে। কারন সেটা সিলেবাসে আছে। এখানে ভোকেসনাল এডুকেসনকে এডুকেসন বলে মানা হয় না। তাই সেগুলো ICSE বা CBSC এদের মত কোন বোর্ডের আওতায় পরে না। এডুকেশন কখনো সিলেবাস কেন্দ্রিক হতে পারে না। আজ যদি আমার রান্না করতে ইচ্ছা করে, আমি সেইটা নিয়েই অনুশীলন করবো, এটাই এডুকেশন। বারো ক্লাস অব্দি স্ট্যান্ডার্ড পড়াশোনা করতে হয় এখানে, তারপর হায়ার এডুকেশনের লাইনটা বেছে নিতে পারি। যদি ছোটবেলা থেকে পছন্দের বিষয় চর্চা অনুশীলন করতে পারতাম, তাহলে কি অন্যরকম হবে না? সোশাল ওয়ার্ক বলে একটা সাবজেক্ট রয়েছে, সেটাই জেনেছি বারো ক্লাসের পর। একজন চাষী

আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে দিতে পারে বৃষ্টি হবে কি হবে না। সেটা আবহাওয়া দপ্তর উপগ্রহ বসিয়েও সঠিক বলতে পারে না। নৌকো করে ঘুরছি, আকাশে মেঘ। মাঝিকে বললাম বৃষ্টি হবে? বলল, না না, হাওয়ায় এই মেঘ উড়ে যাবে। ঠিক সেটাই ঘটলো। কিন্তু গুগুলে লেখাছিল থান্ডারস্টর্ম হতে পারে। গুগলে প্রবাবলিটির কথা ছিল। মাঝির বক্তব্যে সম্ভাবনা নয়। একদম সহজ স্টেটমেন্ট যে বৃষ্টি হবে না। পিঁপড়েরা থাকে মাটির তলায়, সেও বৃষ্টি হবে বুঝে নিয়ে ডিম মুখে নিয়ে বেরিয়ে আসে আগেই। তাদের দেখে বুঝতে পারি বৃষ্টি হবে। কামিনীগাছের কুঁড়ি এলে, ফুল ফুটলে বৃষ্টি হবে বুঝতে পারা যায়। ওই পিঁপড়ে বা কামিনীগাছটাও যে খবর পায়, আমরা উপগ্রহ লাগিয়েও সেই সত্য জানতে পারি না। কাশফুল জানে তাকে শরৎকালেই ফুটতে হবে। হাস্নুহানা জানে তাকে শুক্লপক্ষেই ফুটতে হবে। আমার প্রয়োজনে তারা ভিন্ন সময় ফুটবে না। তাহলে সাসটেইনেবেল কোনটা? টেকনোলজি? বারোক্লাস অব্দি নানারকম কিছু পড়ে সময় নষ্ট হয় না? হর্ষবর্দ্ধনের পিসেমশাই কে ছিল। আকবরের জেঠামশাই কবার কামান দেগেছিল কিংবা মাদাগাস্কারের রাজধানীর নাম কী। উইলিয়ম ওয়র্ডস্বর্থের বোন ডরোথী কবে ইয়ারোনদী দেখতে গেল, আমি কেন সেসব শিখবো। কিংবা সোডিয়াম কার্বোনেট কী দিয়ে তৈরী অথবা কেঁচোর জননতন্ত্র কেন আমি শিখবো। আমার পছন্দের জিনিস না শিখে? এইসবের ফলে আমাদের অসুবিধা।

আমাদের সমাজে পরিবারগুলো আগে সাসটেইনেবেল ছিল। একটা আধ্যাত্মিক বন্ধন ভাবা হতো বিবাহকে। তারফলে বাবা-মায়েদের মধ্যে মতের অনেক অমিল থাকলেও সেই স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক ছিল সাসটেইনেবেল। এখন এটা একটা চুক্তি। আমার বাবা-মায়ের বিবাহ রেজিস্ট্রি করতে হয়নি। কিন্তু সাসটেইনেবেল হয়েছিল। আমরা এখন আইনগতভাবে বিবাহ রেজিস্ট্রি করতে বাধ্য হই, তবু সাসটেইনেবেল হচ্ছে না। মিছরিকে জলে ফেলে দিলে সঙ্গে সঙ্গে জলটা মিষ্টি হয়ে যায় না। মিছরিকে জলে মিশে যেতে সময় দিতে হয়। সেই সময়টা আমরা এ্যালাও করি না। এতটাই আমরা অধৈর্য, এতটাই আমাদের ছটফটানি যে এক্ষুনি সবটা হয়ে যেতে হবে, পেয়ে যেতে হবে। এই যে শিক্ষার ত্রুটি, তার ফলে পরিবারগুলিও সাসটেইনেবেল হচ্ছে না, ভেঙে যাচ্ছে। অক্সিজেনের অভাবে, কার্বনডাই অক্সাইডের প্রভাবে কিংবা অর্থের অভাবে, দারিদ্রের প্রভাবে পরিবারের সাসটেইনেবিলিটি নষ্ট হয় না। পরিবার ভাঙছে মানুষের শিক্ষার অভাবে। মানসিক শিক্ষার ঘাটতির জন্যে। সম্পর্কের সাসটেইনেবিলিটি থাকছে না। সম্পর্ক ভেঙে ফেলার এই ভাবনাচিন্তা আমরা গ্রামে গিয়ে পাবো না। তাঁরা মনে করেন আমরা বিবাহ করেছি, মতের অমিল হতে পারে, তবুও সুখে-দুঃখে একসাথে থাকবো। আমরা এখানে ওয়ান পার্সন ওয়ান ইউনিট।

পুরুলিয়ার গ্রামে দেখেছি আমার মত ৩০-৩২ বছরের মেয়েরা সবাই বিধবা। তাদের

১৬-১৭ বছরে বিয়ে হয়। ৩০ বছরেই বিধবা হয়। তাদের স্বামীরা চোলাই মদ খেয়ে খেয়ে মরে যায় সিরোসিস অফ লিভারে। এবার মহিলারা সংগঠিত হয়ে পুলিশের সাহায্যে মদ বন্ধ করেছে। অনেক অশান্তি হয়েছে। মেয়েদের উপর মারধোর হয়েছে। মেয়েদের বক্তব্য ছিল মারো ধরো যাই করো। আমি বিধবা হতে পারবো না। এই যে বন্ডেজ, এখন পরিবারগুলি সাসটেইনেবেল। শহরের শিক্ষিত মেয়েরা সম্পর্ক ভেঙে চলে যেতো। সন্তানরা হোমে বড় হতো অনাথ শিশু হয়ে সবুজ সংঘের নয়নতারা প্রজেক্টের শিশু হয়ে যেতো। না হয় সবুজ সংঘের নতুন আলো প্রজেক্টের শিশু। ওই গ্রামের মেয়েরা অল্টারনেটিভ ওয়ে অফ সার্ভাইবাল বেছে নিয়েছে টু ওয়ার্ডস্ দেয়ার সাসটেইনেবিলিটি।

আমি একটা কাজ করতে গিয়ে বাধা বিপত্তি পেলাম। অন্য পন্থা নিয়ে আমি করলাম এবং তাতে ফল যদি ভাল হয়, সেটাও তো সাসটেইনেবেল হল। তবে ওই যে কেনা কলম, বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্ক কিনে যাদের ভাড়াটে লেখক, ভাড়াটে গবেষক বানানো হয়েছে কারুর পক্ষ নিয়ে কথা বলার জন্য, লেখার জন্য, সেই কেনা লেখক, কেনা গবেষকরা সাসটেনেবেল ডেভেলপমেন্টের একটা ডেফিনেসন দেবার চেষ্টা করছে। সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্টের কোনো ডেফিনিসন হয় না। ইট ইজ ট্রায়াল এ্যান্ড এরর মেথডলজি। এর কোন ফর্মূলা নেই। এমন নয় যে এই স্টেপ করলে ওইটা ফল হবে। তারপর ওই স্টেপ করতে হবে। এরকম বাঁধা ছকে সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট চলে না। অনেকের লেখায় এসব ফর্মূলার কথা পড়েছি। সেটা সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট নয়।

সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট মেনস্টুরেসনেও আছে। 'ইফ মেন কুড মেনস্ট্রুয়েট' নামে একটি আর্টিকেল প্রকাশিত হয়েছিল। গ্লোরিয়া স্টেইনোম লিখেছিলেন, ২০১৯ সালে উইমেন্স রিপ্রোডাকটিভ হেলথ। ভলিউম ৬, নং ৩—এ। সেখানে বলা হয়েছে ছেলেদের মেনস্ট্রুয়েসন হলে তাদের পুজো করা হত। কিন্তু মেয়েদের কাউশেডে রেখে দেয়া হয়। আগে মেয়েদেরও মেনস্ট্রুয়েট হলে পুজো করা হত, আসামের কামরূপ কামাখ্যা মন্দিরে অম্বুবাচী উৎসব তার প্রমাণ। দক্ষিণ ভারতের কিছু জায়গায় সেরকম সেলিব্রেসন হয়। কিন্তু সারা দেশে কী হয়, এই সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন কীভাবে এলো। তার মানে? সাসটেইনেবিলিটি সংস্কৃতির ধারায় ছিল, বদলে দেওয়া হয়েছে। ওই ভেদাভেদটা ছিল না। প্রাকৃতিক বিষয়কে প্রাকৃতিক হিসাবেই মেনে নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এখন পরিবর্তন করে দিল। সেটাও মেনে নিচ্ছি। আসলেই সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে খুব ডায়নামিক কনসেপ্ট। কোন রিজিড বিষয় নয়, কোনো ফর্মূলায় ফেলা বাঁধা গতের বিষয় নয়। এটা বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্নরকম হবে, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন মানুষের হাতে বিভিন্নরকম হবে। □

সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট — তত্ত্ব ও বাস্তবতা

ডঃ বিদ্যুৎ মজুমদার

বিশ্বব্যাঙ্কের ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গ্যানাইজেসনের কাজে নিযুক্ত ডঃ বিদ্যুৎ মজুমদার আমেরিকার সেন্ট জেম্‌স্ স্কুল অফ মেডিসিনের কলকাতা শাখার কর্নধারও বটেন। সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কী ভাবছেন বিদ্যুৎ?

ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানোর পক্রিয়াকে বিঘ্নিত না করে, বর্তমানের চাহিদা মেটাতে সক্ষম যে উন্নয়ন, তাকেই Sustainable Development বা দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন বলা যায়। বিষয়টি একটু সহজ ভাবে বোঝার জন্য একটি উদাহরণের আশ্রয় নেওয়া যাক। অন্ধকার ঘরে একটি প্রদীপ জ্বালানোর সাথে সাথে ঘরটি নিমেষে আলোকিত হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই আলোর স্থায়ীত্ব ততক্ষণই, যতক্ষণ প্রদীপের মধ্যে তেল সরবরাহ অক্ষুন্ন থাকে। তেল শেষ হলেই প্রদীপের আলো নিভে গিয়ে আবার সেই অন্ধকার। কিন্তু যদি কোনো স্বয়ংক্রিয় পক্রিয়ায় প্রদীপটির মধ্যে নিজের থেকেই জ্বালানী তৈরী হতো, তাহলে ঐ প্রদীপটি দীর্ঘ সময় ধরে জ্বলতেই থাকতো। পাশাপাশি যে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় প্রদীপটির মধ্যে জ্বালানী তৈরী হচ্ছে, সেটার কারণে ভবিষ্যতের কোনো সম্পদের অভাব তৈরী হবে, এমনটা হলেও কিন্তু চলবে না। তখনই এই প্রদীপটিকে Sustainable বা দীর্ঘস্থায়ী বলা যেতে পারে।

বর্তমান বিশ্বে চোখ মেলে যে উন্নয়ন বা যে আধুনিক সভ্যতা আমাদের চোখে পড়ে, তার কতটা Sustainable সে বিষয়ে প্রশ্ন ওঠার যথেষ্টা অবকাশ রয়েছে। মানব সভ্যতার বিকাশ ও উন্নয়নের একটি বড় পদক্ষেপ হলো কাগজ আবিষ্কার। যে কাগজ কিনা অজস্র

বৃক্ষ ছেদন করে তৈরী করতে হয়। এইভাবেই মানব সভ্যতার উন্নয়নের রকেট ছোটাতে গিয়ে আমরা ইচ্ছামতো প্রতিনিয়ত মাটির নীচের জল তুলে ফেলেছি, পাথর খাদান থেকে পাথর কেটে এনে বাড়ি বানাচ্ছি, রাস্তা বানাচ্ছি। কয়লা এবং খনিজ তেল যেমন প্রেট্রোল, ডিজেল ওগুলির উপরেই তো বর্তমান বিজ্ঞানের জয়যাত্রা তথা মানব সভ্যতার বিকাশ ও উন্নয়ন পুরোপুরি ভাবে নির্ভরশীল। কিন্তু এই প্রাকৃতিক সম্পদগুলির ভান্ডার যখন শেষ হয়ে যাবে, তার পরিণতি কী হতে পারে সে বিষয়ে আমরা কি ওয়াকিবহাল? প্রাকৃতিক সম্পদের ধবংস লীলার মাধ্যমে জীবনযাত্রার যে মানদন্ডে আমরা পৌঁছালাম, সেটি কি আদৌ Sustainable?

1992 সালের ব্রাজিলে যে United Nations conference on Environment and Development (UNCED)অনুষ্ঠিত হয়, সেখানেই প্রথম Sustainable Development-এর উপর বিশেষ ভাবে আলোকপাত করা হয়। তারও আগে 1970 সালে International Institute of Environment and Development (IIED)-র প্রতিষ্ঠাতা মাননীয়া লেডি জ্যাকসন অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সাথে প্রাকৃতিক সম্পদের সমীকরণ প্রসঙ্গে এই "Sustainable Development"শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেন।

বর্তমানে বিজ্ঞানীরা এই Sustainable Development কে চারটি দৃষ্টি কোণ থেকে বিশ্লেষণ করে থাকেন। সেগুলি হলো :

১। মানব সম্পদের স্থায়ীত্বকরণ : (Human Sustainability)

২। সামাজিক স্থায়ীত্ব করণ : (Social Sustainability)

৩। অর্থনৈতিক স্থায়ীত্বকরণ : (Economic Sustainability)

৪। প্রাকৃতিক সম্পদের স্থায়ীত্বকরণ : (Environmental Sustainability)

বলা বাহুল্য এই চার প্রকার "Sustainability" একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।

মানব সম্পদের স্থায়ীত্ব নিয়ে কাজ করতে হলে প্রথমেই স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি এবং কর্ম সংস্থানের উপরেই জোড় দিতে হয়। সামাজিক স্থায়ীত্বের ক্ষেত্রে 'Community' এবং 'Culture' এই দুটি বিষয়ের দিকে বিশেষ ভাবে নজর দিতে হবে। আধুনিক বিশ্বায়নের ধাক্কায় কোনো 'Community' বা কোনো 'Culture' যাতে কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সেটা লক্ষ্য রেখেই এগোনো উচিত। আবার সামাজিক মান উন্নয়নের চাবিকাঠি হলো আর্থিক উন্নয়ন। কিন্তু এই আর্থিক উন্নয়ন ঘটাতে গিয়ে অতিরিক্ত মুনাফা লাভের আশায় সম্পদের যথেচ্ছ অপব্যবহার স্বল্প মেয়াদেই মারাত্মক ক্ষতিকারক হয়ে উঠতে পারে। আর

এ কথাও অনস্বীকার্য যে এই সকল প্রকার উন্নয়নের স্রষ্টা, ধারক এবং বাহক হলো প্রাকৃতিক সম্পদ। পদার্থ বিজ্ঞানের নিত্যতা সূত্র অনুযায়ী ভর বা শক্তি, সৃষ্টির আদিতে যা ছিল আজও তাই বিদ্যমান। কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষেত্রে এই নীতি খাটে না। বনভূমি, ভূগর্ভস্থ জল, কয়লা, পেট্রল এই সম্পদ গুলি আমরা শুধু ধবংসই করতে পারি, সৃষ্টি করতে পারি না। অগত্যা সাবধানতা অবলম্বন তথা বিলাসিতা বর্জন একান্ত কাম্য।

তা হলে "Sustainable Dvevlopment" শব্দবন্ধটি কি আদৌ বাস্তবে সম্ভব--- নাকি, সোনার পাথর বাটির মতই অবাস্তব। Byproduct "দূষণ" ছাড়া কি আধুনিক যান্ত্রিক বিকাশ আদৌ ঘটানো সম্ভব? উত্তর হলো হ্যাঁ সম্ভব। এখানেই তো বিজ্ঞানের সাথে মানুষের শুভবুদ্ধির মিশ্রণের প্রায়োগিক সাফল্য। প্রকৃতির কিছু কিছু সম্পদ তো সত্যিই অফুরন্ত। মায়ের স্নেহের মতই প্রকৃতি আমাদের সেই সম্পদ উজার করে দিয়েছে। মা যদি সুস্থ থাকে তবে সন্তানের পানের জন্য দুধের অভাব হয় না। এই রকম কয়েকটি প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগিয়ে সভ্যতার বিকাশকে অনায়াসে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। এই রকম কয়েকটি সম্পদ হলো :

সৌরশক্তি (Solar Energy) : এই অফুরন্ত শক্তিটির যথাযথ ব্যবহার, কয়লা থেকে প্রাপ্ত শক্তি ব্যবহারের ফলে উদ্ভুত দূষণের তুলনায় 94% পর্যন্ত কম করতে সক্ষম। আর সেই কারণেই বৈদ্যুতিক সংযোগ হীন গ্রামে, চাষের জমিতে সেচের মটর চালানোর প্রয়োজনে এমন কী গৃহস্থালীর কাজেও Solar Panel বসিয়ে সৌরশক্তির ব্যবহার উত্তোরত্তর বেড়েই চলেছে।

বায়ুশক্তি (Wind Energy) : ঝঞ্ঝা প্রবন এলাকা, মূলত সামুদ্রিক এলাকায় এই বায়ু শক্তিকে কাজে লাগিয়ে অনায়াসেই বিদ্যুৎ তৈরী করা যেতে পারে, যা থেকে দূষণের মাত্রাও যেমন নগণ্য, তেমনই Sustainability ও অনন্ত কাল।

পাশাপাশি কিছু সাবধানতা এবং পদ্ধতি প্রয়োগ করেও মানব সভ্যতার বিকাশকে দীর্ঘস্থায়ী করা যায়। জলের অপচয় রোধ করা, Crop Rotation পদ্ধতিতে কৃষি কাজ করা, বনসৃজন করা ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্পর্কে অবহিত করতে পারলে আমাদের এই পৃথিবী নামক গ্রহটি এক অনাবিল শান্তির গৃহ হয়ে উঠতে পারে।

এই সকল উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই 2015 সালে রাষ্ট্র সংঘ (UN) মোট 17 দফা লক্ষ্য মাত্রা নিয়ে পনেরো বছরের জন্য এক বিশেষ কর্মসূচী "2030 Agenda for Sustainable Development Goal (SDG) পূরণ করার জন্য 2019 সালের September মাসে অনুষ্ঠিত "SDG Summit" এর পরবর্তী দশ বছর অর্থাৎ 2020 থেকে 2030 সাল পর্যন্ত দশকটিকে "Decade of Action" হিসাবে ঘোষণা করে। এই সময়কালের মধ্যে

ওই লক্ষ্যমাত্রা পূরণের উদ্দেশ্যে Global Action, Local Action এবং People Actions এই তিনটি পদ্ধতিতে বিভিন্ন কর্মসূচী যেমন দারিদ্র দূরীকরণ, মহিলা স্বশক্তিকরণ, জলবায়ু সংরক্ষণ ইত্যাদি গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে ইতিমধ্যেই প্রকাশিত "Sustainable Development Goals Report-2022" থেকে দেখা যাচ্ছে যে Covid-19, climate change এবং আর্ন্তদেশীয় দ্বন্দ্বের কারণে "2030 Agenda for Sustainable Development" কর্মসূচী তার লক্ষ্যমাত্রা থেকে বেশ অনেকটাই পিছিয়ে আছে। রিপোর্টে এও বলা হয়েছে 2030 সালের মধ্যে সত্যিই যদি এই গ্রহটিকে রক্ষা করতে হয় তবে ক্ষুধা নিবারণ, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়গুলির উপরে অচিরেই আলোকপাত একান্ত জরুরী।

এই প্রসঙ্গে গর্ব করার মত বিষয় হলো এই যে উপরি উক্ত 17 দফা লক্ষ্যমাত্রা পূরণের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। Sustainable Development এর কথা বিবেচনা করেই ভারত সরকার বেশ কিছু Flagship প্রোগ্রাম চালু করেছেন যার মধ্যে "স্বচ্ছ ভারত মিশন", "গ্রীন স্কীল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম", "নমামি গঙ্গে" ইত্যাদি অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও SDG-র নির্ধারিত স্তরে পৌঁছানোর জন্য ভারত সরকার যে পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করেছেন সেগুলি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন —

১। 2015 সালে জলবায়ু পরিবর্তনের উপর 21তম "United Nations Frame work Convention" এর প্যারিস চুক্তির শর্তগুলিকে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

২। 2016 সালে বিকল্প জ্বালানী, Renewable Energy, Solid waste Management ইত্যাদির মতো "Clean Development Mechanism" Projects গুলির জন্য বিশ্বের মধ্যে ভারতবর্ষ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

৩। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে "National Adaptaion Fund for Climate Change" এবং Clean Energy-র উপর গবেষণার জন্য "National Clean Energy Fund" নামের বিশেষ তহবিল খোলা হয়েছে।

Sustainable Development এর পথে ভারতবর্ষের এই পদক্ষেপ গুলি আগামী প্রজন্মকে এক দূষণ মুক্ত পৃথিবী উপহার দেবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। □

গ্রামসেবা

অংশুমান দাস

একটা নতুন এলাকায় সিভিল সোসাইটি অর্গ্যানাইজেসন কীভাবে সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন করে, কীভাবে কর্মী তৈরী করে সেই কর্মীদের মাধ্যমে অচেনা অজানা গ্রাম এলাকায় নানা ধর্মের, নানা রাজনৈতিক বিশ্বাসের নানারকম অর্থনৈতিক শ্রেণীতে বিভক্ত মানুষের মধ্যে ঢুকে কাজ শুরু করে তা নিয়ে অনেকের মনে বিস্তর কৌতূহল আছে। নদীয়া জেলার কল্যাণী ব্লকের সিমুরালি পঞ্চায়েতের পাঁচটি গ্রামে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ফাউন্ডেসনের আর্থিক সহায়তায় 'গ্রামসেবা' প্রকল্পটি মাত্র কয়েকমাস শুরু হয়েছে। সবুজ সংঘ এই 'গ্রামসেবা' প্রকল্প সেখানে বাস্তবায়ন করছে। একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে সংঘের সেক্রেটারী সেখানে কর্মী প্রশিক্ষণ দিতে গিয়ে কী কী বললেন সেদিন? সবুজ সংঘের কোন কাজই শুরু হবার পর গত তিরিশ বছরে বন্ধ হয়নি, চালু থেকেছে। সাসটেইনেবেল হয়েছে। কর্মীদের মোটিভেসনটা কী দেওয়া হয়? রহস্যটা কী?

এক.

উপস্থিত সবাইকে আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা সবাই একটা দল হিসাবে কাজ করি। বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন দিনে আমরা কাজের সাথে যুক্ত হয়েছিলাম। এখন বোঝা দরকার আমরা সবাই মিলে কী করতে চাই। এটা যদি বুঝতে না পারি, তাহলে আমাদের পক্ষে লক্ষ্যে পৌঁছানো খুবই মুস্কিল হবে। আজকের আলোচনাকে দুভাগে ভাগ করতে চাই। এই প্রোগ্রামটার নাম আপনারা সবাই জানেন। 'গ্রাম সেবা', 'গ্রাম সেবা' (সমবেত কণ্ঠে)

হ্যাঁ। গ্রাম বলতে আমরা সবাই জানি সেটা কী। কিন্তু 'সেবা' বলতে আমরা সবাই কী বুঝছি। 'সেবা' কথাটাতে একেকজন একেকরকম ভেবে থাকেন।

বেশ, মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে তাঁদের সমস্যা চিহ্নিত করে তার সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া। নির্দিষ্ট এলাকার মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের হাতে হাত মিলিয়ে তাদের সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে। এটাই আপনাদের

সবার সম্মিলিত উত্তর। আমরা যেটা চেষ্টা করি, কোন একটা নির্দিষ্ট গ্রামে ধনী দরিদ্র মধ্যবিত্ত নানা ধরনের মানুষ বাস করে। তাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জীবন জীবিকা, তাদের কারিগরি দক্ষতা, চেতনা মূল্যবোধ সবদিক দিয়ে যদি আমরা দেখি, কোথাও এগুলোর অভাব আছে। কেউ হয়তো আবার শিক্ষায় বা অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে আছে, আমরা সেখানে এই গ্রামসেবার মাধ্যমে একটা সমতা নিয়ে আসার চেষ্টা করি, যাতে বেঁচে থাকার জন্যে যে রসদ বা সাহায্য সেটা যাতে ওই গ্রামের মধ্যেই আমরা পেতে পারি।

এখন ভেবে দেখুন, আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি, কিন্তু পরস্পরকে চিনি না। আমরা জোড়া বাঁধি। জোড় বেঁধে বেঁধে পরস্পর সম্পর্কে জেনে নিয়ে একের হয়ে অন্য পার্টনার পরিচয় দিক বরং।

পরিচয় পর্ব সম্পূর্ণ হয়েছে। এবার বলুনতো অন্যের পরিচয় বিশদে জেনে যখন আমরা পরিচয় দিচ্ছিলাম কেমন লাগছিল? আপনারা বলছেন যে, এভাবে অন্যকে জানাটা বেশ ভালই লেগেছে। তার সত্তাকে নিজের মধ্যে নিয়ে এসে তার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছিলেন এটা একটা নতুন অনুভূতি। কেউ বলছেন, আপনার পার্টনার সম্পর্কে জানবার কোন আগ্রহ ছিল না। কিন্তু যখন জানছিলেন এবং সেগুলো বলছিলেন, আপনার একটা অন্যরকম অনুভূতি হয়েছে। কেউ বললেন, দুজনে এতদিন কাজ করেছেন। অথচ একে অপরের সম্পর্কে এতকিছু জানতামই না। এই গ্যাপটা পূরণ হল। আমরা নিজেদের পদের বাউন্ডারিতে আটকে ছিলাম, তাই অন্যদের বুঝতে চেষ্টা করিনি। আজকে সেই বাউন্ডারিটা মুছে গেল, একথাও আপনারা বলেছেন। পরস্পরের অনেক কাছাকাছি আসতে পেরেছেন বলছেন।

এখন ভেবে দেখুন। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। আপনারা গ্রামসেবা বলতে যে ব্যাখ্যা করেছেন, যে একটা গ্রামের মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তার পাশে থেকে তার সমস্যা মেটাতে আমরা চেষ্টা করব। সেই একাত্ম হয়ে তার পাশে থাকতে হলে আজকে আপনার সহকর্মীকে যেরকম অন্তরঙ্গভাবে সব মানসিক বাউন্ডারি ঘুচিয়ে দিয়ে পরস্পরকে আমরা জানলাম, সেইটাই করতে পারতে হবে গ্রামের সকলের সঙ্গে। সেই বিষয়টাই হাতে কলমে অনুশীলন করে তার অনুভূতিটা কেমন হতে পারে, পরস্পর পরিচয় দিতে এবং নিতে গিয়ে সেটা আমরা সকলে অনুধাবন করতে পেরেছি বলে আশা রাখি।

আমরা যখন বাচ্চাদের সঙ্গে অথবা মায়েদের সঙ্গে কাজ করি, তাদের সমস্যা ভাল করে বুঝতে হয়। এই যে পরস্পরকে জানার চেষ্টা করলাম। তার নাম, তার ঠিকানা শুধু নয়, তার পছন্দ, অপছন্দ, সে কি খেতে ভালবাসে সবই জানতে পারলাম। যখন গ্রামে কাজ করতে যাই। তাদের কথা এভাবে খুব মন দিয়ে শুনতে হয়। না শুনলে তার কাছ থেকে আমরা শিখতেও পারবো না, তার সমস্যা সমাধানতো অনেক দূরের কথা। আমরা শিশুদের সমস্যা বুঝতে না পারলে, তার পোটেনশিয়ালিটি জানতে না পারলে ওই শিশুর হয়ে আমরা প্রোগ্র্যাম ম্যানেজারের কাছে প্রতিনিধিত্ব করি। কি লাগবে, কি দরকার,

কোনটা দরকার নেই, এসবতো আমরা করতেই পারবো না। কি সাপোর্ট লাগবে আমরা বুঝবো কি করে? ওই গ্রামের মানুষের সম্পর্কে তাদের কাছ থেকে পাওয়া খবরগুলোই যদি আমার কাছে না থাকে, তাহলে ওই গ্রামসেবার নামে তাদের যে সমস্যা সমাধানের জন্য সহযোগিতা করব ঠিক করেছি, সেটা করা যাবে না। আবার একটা বড় ফোরামে নিজের মনের জড়তা কাটিয়ে কীভাবে বলতে পারতে হবে, সেটাও আমাদের অনুশীলন হল।

এখন আমরা একটা কর্মীদল হিসেবে 'গ্রামসেবা' সম্পর্কেও আমাদের ধারণা একইরকম থাকা দরকার। যাকে বলে কমোন আন্ডারস্ট্যান্ডিং। যিনি গাড়ি চালাচ্ছেন, যিনি গাড়িটাতে চেপে যাচ্ছেন উভয়েরই একটা স্বচ্ছ ধারণা থাকা চাই যে গাড়িটা কোথায় নিয়ে যেতে হবে, কেন নিয়ে যেতে হবে, কী লাভ হবে নিয়ে গিয়ে। তাই না? ঠিক সেই রকম এই গ্রামসেবাটা কী? কেন এই প্রকল্প নদীয়া জেলার কল্যাণী ব্লকের এই সিমুরালি গ্রাম পঞ্চায়েতে তৈরী হয়েছে? যিনি শিক্ষা বিভাগের দায়িত্বে, যিনি গ্রামসেবা কেন্দ্রটি চালাচ্ছেন সবার এ বিষয়ে ধারনা একরকম থাকতে হবে। কেউ প্রশ্ন করলে সকলে আমরা সেইভাবে যাতে বলতে পারি। বোঝাতে পারি। মানুষকে বোঝাতে গিয়ে একেকজন একেকরকম বোঝালে লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে না। যিনি গাড়ি চালাবেন, তিনিও জানবেন ওই গাড়িটা তিনি কেন চালাচ্ছেন, কার স্বার্থে চালাচ্ছেন, কোন লক্ষ্য উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাজ করে চলেছেন সে বিষয়ে স্বচ্ছতা সকলের থাকা দরকার।

কোন একটা দেশের জাতীয় সংগীত বললে একই সঙ্গীত সেই দেশের সকলেই করে। অনেকটা সেই রকম 'গ্রামসেবা' নিয়ে ধারণাও এই প্রকল্পে যুক্ত কর্মীদের শুধু নয়, যুক্ত সকল মানুষের ধারণাই একটা হতে হবে।

এই 'গ্রামসেবা' কী, সেটা বুঝেছি। এই সিমুরালি গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচটা গ্রামে এই 'গ্রামসেবা' নামে প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্যটা কী? কেন এই প্রকল্প। একটা নির্দিষ্ট সময় পরে ঠিক কী আমরা দেখতে চাই। আমরা সবাই মিলে একেকজন এক এক রকমের কাজে নিযুক্ত থেকে কাজ করব। সেইসব কাজ থেকে এক একটা রেজাল্ট বা ফল তৈরী হবে। সেই রেজাল্টটা কী? কোন উদ্দেশ্য পূরণ হবে? সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় বিষয়। তৃতীয় হচ্ছে সেই উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্যে আমাদের কী কৌশল বা স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ করতে হবে। মানে কোন পদ্ধতিতে আমরা উদ্দেশ্য সাধন করতে পারবো। তারপর চতুর্থত আমাদের দেখতে হবে, যে ওইটা যদি স্ট্র্যাটেজি হয়, তার প্রতিটির জন্য কিছু কাজ বা এ্যাকটিভিটি থাকবে। সেই কাজগুলো তখন আমাদের বুঝে নিতে হবে। সবাই কি একই কাজ করবো? পরিচয় পর্বে কেউ বলেছেন তিনি এডুকেসন ইনচার্জ, কেউ বলেছেন গ্রামসেবা কেন্দ্র মানে জিএসকে ইনচার্জ, কেউ ক্যাম্প অপারেটর। কেউ এ্যাকাউন্টের কাজ করেন। কেউ ডকুমেন্টেসনের কাজ করেন এরকম বলেছেন। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে সবাই একই কাজ করছি না। বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন কর্মী দায়বদ্ধ।

সেই কাজের জন্যে আমাদের রোল রেসপনসিবিলিটি, মানে আমাদের ভূমিকা এবং দায়িত্ব কী কী? সেই দায়িত্ব পালন করার দক্ষতা আমাদের আছে কিনা। যদি সেই দক্ষতা আমাদের না থাকে, তাহলে কোথায় আমাদের ঘাটতি আছে। সেটাও চিহ্নিত করতে হবে। সেই ঘাটতি পূরণ করেই কাজে নামতে হবে। না হলে সবার কাজের যৌথ ফলাফলের ভিত্তিতেই একটা প্রকল্পের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ হয়। সেখানে কোনো একটা ক্ষেত্রেও ঘাটতি থাকলে সেই উদ্দেশ্যপূরণ হবে না। ঘাটতিগুলো চিহ্নিত হলেই, কোথায় কার জন্য কী ধরনের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং বা দক্ষতাবর্দ্ধক ব্যবস্থাপনা লাগবে, সেই পরিকল্পনাটা করা সম্ভব হবে। আর সবশেষে আমাদের সাসটেইনেবিলিটি নিয়ে ভাবতে হবে। গ্রামসেবা প্রকল্পের তো একটা মেয়াদ আছে। সেই মেয়াদ শেষ হবার পরেও গ্রামসেবার কাজ স্থায়ী হবে। তাহলে প্রথম হল গ্রামসেবা কী। দ্বিতীয় হচ্ছে গ্রামসেবার উদ্দেশ্য, তৃতীয় হচ্ছে গ্রামসেবা প্রোগ্র্যামের স্ট্র্যাটেজি, চতুর্থ এ্যাকটিভিটিজ্, পঞ্চ ম রোল এবং রেসপন্সিবিলিটি প্রতিটি পদের জন্য, ষষ্ঠ হচ্ছে সেই দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে দক্ষতার ঘাটতি চিহ্নিত করা, সপ্তম সেই ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা করা এবং অষ্টম হচ্ছে এই 'গ্রামসেবা' প্রোগ্রামের স্থায়ীত্ব।

এখানে বুঝে নিতে হবে, আমরা যে কর্মী যে কাজটা করবো, আমাদের কাজ বিশ্বের ডেভেলপমেন্টে কোথায় কোথায় অবদান রাখছে। অনেকেই আমরা কাজ করছি। সরকার করছে, আমরা সিভিল সোসাইটি করছি, অনেক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান করছে। সবাই আমাদের দেশের পরিবর্তন দেখতে চায়। বিশ্বের পরিবর্তন দেখতে চায়। ইউনাইটেড নেশনস বা জাতিসংঘের পক্ষ থেকে যে সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট গোল ঠিক করা হয়েছে, আমাদের এইসব ছোট ছোট কাজের ফল সেই এসডিজিতে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে কিনা। আমরা এই শিমুরালির পাঁচটা গ্রামে পনেরোজন কর্মী যেটুকু কাজ করছি, সেটা বৃহত্তর একটা ক্ষেত্রে অবদান রাখছে। অর্থাৎ জাতিসংঘের সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট গোলের আমরাও অংশীদার। আমাদের স্বাস্থ্য, জীবন জীবিকা, শিক্ষা এইসব কাজই এক একটা থীম-এর অংশ যা সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট গোলে কন্ট্রিবিউট করছে। জীবন জীবিকার কথা যখন বলছি, তখন চাইছি আমরা ওই কাজের এলাকায় এমন কেউ থাকবে না যে জীবনযাত্রার ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে পারছে না। যাতে সবাই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়, আমাদের দক্ষতাটা দিয়ে আমাদের রুজি রোজগারটা যেন নিশ্চিত করতে পারি। এইভাবে ভাবতে হবে।

দুই.

এখন আমাদের এই আলোচনা চলতে চলতে আপনাদের ঘুমিয়ে পড়া চলবে না। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ঘুম পেতে পারে। একটা গল্প বলি। অভিমন্যুর কথা জানি আমরা সবাই। সপ্তরথী তাকে যখন ঘিরে ধরেছিল, তিনি সেই ব্যূহভেদ করে ঢুকে গেছিলেন। বের হতে পারেননি। শোনা যায় যে মাতৃগর্ভে থাকার সময় এই সপ্তরথী ভেদ করে ঢুকে

যাবার পদ্ধতিটা শুনেছিলেন, কিন্তু বের হবার কায়দাটা যখন বলা হচ্ছিল অভিমন্যুর মা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। আমরা যারা ঘুমিয়ে যাবো, আলোচনার সবটা মনোযোগ দিতে পারবো না। অভিমন্যুর মতন অবস্থা আমাদের কর্মক্ষেত্রে কর্মযুদ্ধে হয়ে যেতে পারে।

এই যে 'গ্রামসেবা' কথাটা বলছি, এটা একটা প্রকল্পের নাম। গ্রামের হতদরিদ্র পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্যে তাদের সার্বিক বিকাশের জন্যে এই প্রকল্প রচনা করা হয়েছে। ভারতের সরকার এই প্রকল্পের জন্যে পশ্চিমবঙ্গে নদীয়া জেলাকে বেছে নিয়েছে। নদীয়া জেলার মধ্যে আমাদের দায়িত্ব দেওয়া হয় গ্রাম চিহ্নিত করার জন্যে। আমরা শিক্ষা স্বাস্থ্য জীবন জীবিকা প্রভৃতি বিষয়ে পিছিয়ে পড়া এলাকা হিসেবে শিমুরালি গ্রাম পঞ্চায়েতকে চিহ্নিত করেছিলাম। অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার কারণে এই পঞ্চায়েতে নয়টি গ্রাম আছে, তারমধ্যে, পাঁচখানি গ্রাম আমরা বেছে নিয়েছি। এই গ্রামসেবা প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ যে টাকা, তা দিয়ে পাঁচটা গ্রামের কাজ করা যেতে পারে।

এখানে উপস্থিত কর্মীদের মধ্যে অনেকেই আমাদের সঙ্গে নতুন যুক্ত হয়েছেন। তাঁদের একটু সংক্ষেপে হলেও জেনে নিতে হবে যে সবুজ সংঘের সঙ্গে এই কাজগুলো আপনাদের করতে হবে। কিন্তু সেই সংঘের বিষয়টাও অল্পবিস্তর জেনে রাখতে হবে। নামটা শুনলে মনে হবে এটা পাড়ার একটা ক্লাব গোছের, যারা একটু খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পূজা অর্চনা এসব করে। নামের সঙ্গে 'সংঘ' শব্দটা আছে বলে এরকম ভাবনা অনেকের হয়ে থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘ বা জাতিসংঘ মানে ইউনাইটেড নেশন্স-এর বাংলা নামেও সংঘ রয়েছে। যদিও ওই খেলাধুলো করার ভাবনা নিয়েই পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণে মথুরাপুর দু নম্বর ব্লকের শেষদিকে নন্দকুমার পুর পঞ্চায়েত এলাকায় ৪৮ বছর আগে শুরু হয়েছিল ১৯৭৫ সালে। পরবর্তীকালে নববই দশকের শুরুর দিকে এই সংঘ একটি সিভিলসোসাইটি হিসেবে গড়ে উঠতে থাকে গ্রাম উন্নয়নের কাজের দায়িত্ব নিয়ে চলবার জন্যে। দরিদ্র পিছিয়ে পড়া শ্রেণির বেঁচে থাকার জন্যে ন্যূনতম প্রয়োজন যাতে মেটানো যায়। নূন্যতম প্রয়োজন বলতে সবাই খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান ভেবে নেয়। সবুজ সংঘ তার সঙ্গে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদনটাকেও সংযুক্ত করে ভাবতে চায়। এই ছয়টা জিনিসের প্রয়োজন যেন তারা মেটাতে পারে, সেখানে ধনী দরিদ্র মধ্যবিত্তের ভেদাভেদ থাকবে না। এটা আমাদের স্বপ্ন, কবে তা পূরণ হবে আমরা জানি না। কিন্তু আমরা সবাই সমবেতভাবে কাজ করব, প্রত্যেকে প্রত্যেককে সম্মান দেবো এবং নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করব। প্রত্যেক জায়গা থেকে আমরা অংশগ্রহণ করব। সকলের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে হবে। দক্ষিণ ২৪ পরগণার প্রত্যন্ত একটা গ্রাম থেকে সবুজ সংঘের উন্নয়ন যাত্রা শুরু হয়েছিল। এখন আমরা ৮টা জেলায় এই কাজ করছি। উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পূর্ব মেদিনীপুর, কলকাতা, হাওড়া, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, আলিপুরদুয়ার জেলায়। এগুলি বলার কারণ আপনারা যারা নতুন যুক্ত হয়েছেন, তাঁদের জানা দরকার যে সংগঠনে তাঁরা যুক্ত হলেন, তারা কোথায় কী করে। কলকাতায় এই সংগঠনের প্রধান কার্যালয়। সবুজ সংঘের

বর্তমানে সাত আটশো কর্মী রয়েছে। সংঘের নিজস্ব হাসপাতাল, নিজস্ব প্রোডাকসন ইউনিট, নিজস্ব ব্যাঙ্ক নিজস্ব স্কুল, কলেজ রয়েছে। আমরা কোন সংগঠনের সাথে নিজেকে যুক্ত করেছি, নতুনদের জানা দরকার। আমাদের জীবনের লক্ষ্য পূরণ স্বপ্ন পূরণের একটা জায়গা এই সবুজ সংঘ হয়ে উঠতে পারে। অনেক ইন্টারন্যাশনাল চ্যারিটি, অনেক বহুজাতিক সংগঠন আমাদের সাথে যুক্ত।

আবার গ্রামসেবা প্রকল্পে ফিরে আসি। সর্ববৃহৎ ব্যাঙ্ক স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কর্পোরেট সোসাল রেসননসিবিলিটির মাধ্যমে গ্রামের পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্যে এই ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্টের প্রোগ্রাম রচনা করা হয়েছে। মানুষের দক্ষতা বৃদ্ধি হতে পারে। স্বাস্থ্য হতে পারে শিক্ষা হতে পারে, ডিজিটালাইজেসন সব মিলিয়ে সার্বিক বিকাশের ব্যবস্থা এই প্রকল্পে আছে। সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট এই প্রকল্পের একটা প্রধান কথা। ডিজিটালাইজেসন আজকাল একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনলাইন শিক্ষা হোক, কোন জায়গা খুঁজে দেখা, ব্যাঙ্কের সাহায্যে অনলাইন পেমেন্ট করা। মানে সবধরনের কাজেই এই ডিজিটালাইজেসনের গুরুত্ব বাড়ছে। সরকারি কোন স্কিমে ঢুকতে হলে, ছেলেমেয়েদের স্কুলের খোঁজ খবর নিতে হলে, কলেজে এ্যাডমিসন পেতে হলে, রেলের টিকিট কাটতে, বিদ্যুতের বিল মেটাতে সব ঘরে বসে মোবাইল এ্যানড্রয়েড ফোন মাধ্যমে করা সম্ভব হচ্ছে। যে অনেক বৈশি ডিজিটালি আপডেটেড সে বর্তমান সমাজে এগিয়ে থাকবে। তাই শিক্ষা স্বাস্থ্য ডিজিটালাইজেসন, জীবন জীবিকা, ইয়ুথ মানে যুব সমাজের আশা আকাঙক্ষা মানে তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নত করা এ সবই করা দরকার। অনেকে বলে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা একটা সমস্যা। বিপরীত দিক দিয়ে ভাবলে ভারতের ১৪০ কোটি মানুষ মানে ২৮০ কোটি হাত। হাতের সংখ্যা যখন বাড়ছে, তখন আমাদের প্রোডাকটিভিটি বা উৎপাদনশীলতা কেন কমছে। হাত দিয়েই তো কাজ করি। ভারতে যুবশক্তি বেশি। তাদের হাত যদি প্রোডাকটিভিটিতে কাজে লাগে। তাহলে সেই দেশ পিছিয়ে থাকতে পারে না। প্রয়োজন দক্ষতা বাড়ানো। জ্ঞান দক্ষতা না থাকা হাতের আবার গুরুত্ব নেই। হাত তো শিম্পাঞ্জীরও থাকে। হনুমানেরও থাকে। দরকার জ্ঞান দক্ষতা সম্পন্ন হাত। বিভিন্ন সেক্টরের স্কিল চাই। সেই সবদিক ভেবেই এই প্রোগ্রাম ডিজাইন করা হয়। স্কিল ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে লাইভলিহুড এসে যায়।

আমি যদি জিজ্ঞেস করি নদীয়া জেলার প্রধান শিল্প কী কী?

তাঁত, মৃৎশিল্প, আর কৃষি মৎস চাষ পশুপালন (কয়েক জন দুর্বল স্বরে উত্তর দিলেন)।

তাহলে এইসব উত্তর থেকে বোঝা যাচ্ছে আমরা নিজেদের ভাবনাকে সঙ্কুচিত করে রেখেছি। সেটার প্রসার ঘটাতে হবে। এখানে কোন কোন জিনিস আগে তৈরি হতো, তা দিয়ে জীবন জীবিকা নির্বাহ হতো। ধীরে ধীরে কি সে সবের কোন রকম অবলুপ্তি ঘটছে? কিংবা ঘটানো হচ্ছে। সেইসব খুঁজে বের করে এখনকার যুবসম্প্রদায়ের কাছে খবরটা নিয়ে

যেতে হতে পারে। গ্রাম সেবা প্রকল্পটা একটা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্টের কথা ভেবেছে। সেখানকার ডিজিটালাইজেসন, কারিগরি দক্ষতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবন জীবিকা, মানব সম্পদের বিকাশ ঘটানোর মধ্যে দিয়ে সেই সার্বিক বিকাশ ঘটবে ওই এলাকায়। এখন কিন্তু আপনাদের বলতে হবে কোথাও কোন অস্পষ্টতা আছে কিনা। ধারণার স্বচ্ছতা না তৈরি হলে আমরা দলগতভাবে বেশি দূর এগোতে পারবো না। তাই আপনাদের যদি এখনো কোথাও অস্পষ্টতা থাকে বলুন। এখানে নদীয়ার এই প্রকল্পের দায়িত্বে যাঁরা আছেন, তাঁদের প্রশ্ন করে পরবর্তীতে আরও জেনে নিতে পারবেন। প্রকল্পের মূল্যবোধ হচ্ছে পার্টসিপেশন এবং স্বচ্ছতা বা ট্রান্সপ্যারেন্সি। পার্টিসিপেটরি পদ্ধতিতে প্রত্যেকের সমান ক্ষমতায়ন, সমান ধারণাগত স্বচ্ছতা যেন তৈরি হয়। গ্রামসেবা প্রকল্পের ধারণার স্বচ্ছতা এসেছে?

(সমবেত স্বরে) হ্যাঁ, আমরা বিষয়টা ধরতে পারছি।

এরপর তাহলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য বা অবজেকটিভগুলি বুঝতে হবে।

আমরা যখন ডিজিটালাইজেসন বলছি গ্রামসেবা কেন্দ্রের যে চারজন কর্মী রয়েছেন। সে বিষয়ে তাঁদের ধারণা কী রয়েছে?

জনৈক প্রশিক্ষার্থী : ডিজিটালাইজেসনের মানে এ্যানড্রয়েড ফোন ব্যবহার করে অন লাইনে প্রত্যেকের সমান জ্ঞানবৃদ্ধি, ফেসবুক, ইউটিউব ঘাঁটি। কেন ঘাঁটছি জানিনা। এর ভালদিক খারাপ দিক দুটোই আছে। একে শিক্ষার কাজে লাগানো। বিভিন্ন সরকারী স্কিম বিষয়ে জানা এবং কাজে লাগানো সম্ভব।

প্রশিক্ষার্থী : এছাড়া ক্যাশলেস ট্র্যানজ্যাকসন করা সম্ভব। ক্যাশলেস ইন্ডিয়া।

ক্যাশলেস ইন্ডিয়া মানে ভারতবর্ষে টাকা থাকবে না এমন নয়। বলা ভাল, ক্যাশলেস ট্রানজ্যাকসন বা আদান প্রদান। কারেন্সী ব্যবহার না করে, বাড়ি থেকে বেরুবার সময় একটা এ্যানড্রয়েড ফোনই যথেষ্ট। ওয়ালেট ফ্রী মুভমেন্ট।

আরেক অংশগ্রহণকারী : আমাদের জীবনের আধারকার্ড, প্যানকার্ড, এসব ঠিক ঠাক রেখে এনটাইটেলমেন্ট বিষয়টাকে, মানে ভারতীয় হিসাবে আমার আইডেন্টিটিটা বজায় রাখা। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারী আমাদের সোসাল সিকিউরিটি স্কিম যেমন অটল পেনসন যোজনা এই ধরনের স্কিম প্রভৃতিতে যুক্ত হওয়া যায়।

তাহলে গ্রামের যে গ্রাম সেবা কেন্দ্র, সবসময় ওই গ্রামের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে তাকে সেবা দেবার জন্যে তৈরি থাকতে হবে। গ্রামের ছেলেটা উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে কী করবে জানে না। কলেজে সে যাবে। কোন কলেজ কত সীট রয়েছে, সে সেখানে ভর্তি হতে পারে কিনা। কীভাবে ভর্তি হবে সেইসব সাহায্য সে গ্রামসেবা কেন্দ্রে এসে পেয়ে যাবে। তাদের জীবন জীবিকায় এই গ্রামসেবা কেন্দ্রকে কাজে লাগতে হবে। আইটি নলেজ নিয়ে তুমি তৈরি থাকো, মানুষের যে কোন আইটি রিলেটেড সমস্যায় তোমার সহযোগিতা তার লাগবে। গ্রামসেবাকেন্দ্র যারা চালাচ্ছে তারা সমস্ত স্থানীয় ব্যাঙ্কে গিয়ে

বলো যে তোমার ব্যাঙ্কের সার্ভিস আমার গ্রামে নেই, গ্রামসেবাকেন্দ্রকে কাস্টমার সার্ভিস পয়েন্ট (সিএসপি) হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হোক। তোমরা ব্যাঙ্কগুলিতে আবেদন পত্র দাও। অর্থাৎ ওই ব্যাঙ্কের সার্ভিসগুলি এই গ্রামসেবা কেন্দ্র থেকে পাওয়া যাবে। এর জন্য গ্রামসেবাকেন্দ্রগুলিকে সকলের কাছে পরিচিত করো। জনপ্রিয় করে তুলতে লাগবে। তোমার যোগ্যতা দক্ষতা বৃদ্ধি করে সেটা সকলের কাছে তুলে ধরতে হবে। ব্যাঙ্কও কিছু সিএসপি করার লোক খুঁজছে। নির্ভর করছে তোমার দক্ষতা আছে কিনা তার উপর। ডিজিটালাইজেসন আমাদের একটা অবজেকটিভ। গ্রামের মানুষ অনলাইন পরিষেবা পাবার জন্য এখানে আসবে। কোন পরিষেবা দিতে পারবো। কোন পরিষেবা দিতে পারবো না কেন পারবো না সেটাও বোঝাতে হবে। অন্য সিএসপি যারা আছে তাদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েও মানুষকে পরিষেবা দেওয়া যায়। কোন কোন পরিষেবা দিতে পারছি। সেটাও লিখে জানাতে হবে। ব্যাঙ্ক বলতে সবাই জানে টাকা লেনদেনের জায়গা। তার বাইরে যে তারা স্বাস্থ্য শিক্ষা ডিজিটালাইজেসন প্রভৃতি পরিষেবা দেয়, সেটাও মানুষকে জানানো দরকার। এসবিআই ফাউন্ডেসন এসবিআই-এর সামাজিক শাখা। গ্রামসেবাকেন্দ্রের সার্ভিসগুলির খবর গ্রামের প্রত্যেক পরিবারে পৌঁছতে হবে। রেমিডিয়াল টীচার যাঁরা আছেন। তাঁদের সবার কাছে গ্রামসেবাকেন্দ্রের ম্যাসেজটা থাকতে হবে। টীচাররা শুধু ওই ত্রিশ বত্রিশ পঁয়ত্রিশটা বাচ্চার ক্লাস অ্যাটেন্ড করছে কিনা, সেটা নিয়ে, তা নিয়েই শুধু চিন্তা করো।

হ্যাঁ ঠিক তাই (প্রশিক্ষার্থী)।

সেটা করা ভালো। কিন্তু সেটাই সব নয়। আমরা সবাই পৃথক পৃথক কাজ করছি। কিন্তু সামগ্রিক কাজের আমরা সবাই অংশ। গ্রামসেবা কেন্দ্র যারা চালাচ্ছে, তাদের কি মনে হচ্ছে ডিজিটালাইজেসন নিয়ে জ্ঞান দক্ষতায় কোন গ্যাপ আছে। নিজেদের স্কিল ম্যাপিং করে দেখতে হবে দক্ষতা বাড়ানোর জন্যে আরো এ্যাডভান্স কোন প্রশিক্ষণ দরকার রয়েছে কিনা। অন্যান্য কর্মীদের জন্যেও সেটা দরকার।

জনৈক প্রশিক্ষার্থী : বেসিক স্কিল আছে, এ্যাডভান্সমেন্টের প্রশিক্ষনটা চাই।

কিন্তু কোন কোন স্কিল থাকলে বেসিক হয়, সেটাও কি আমরা সবাই জানি? যতটুকু স্কিল রয়েছে, সেটা যে বেসিক, তা কি করে জানছি? কোনখান থেকে এ্যাডভান্সমেন্ট ঘটাতে হবে এসব বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা আছে কি? কম্পিউটার খোলা বন্ধ করাটাতো বেসিক জ্ঞান নয়। যখন কেউ প্রাইমারি স্কুলে পড়ে, ধীরে ধীরে মাধ্যমিক দেয়। উচ্চমাধ্যমিক দেয়, গ্র্যাজুয়েসন করে। পোস্ট গ্র্যাজুয়েসন করে। পিএইচডি করে— জ্ঞানের বিভিন্ন স্তর। কোনটা বেসিক। কতটা হলে বেসিক হয়। কোনখান থেকে এ্যাডভান্সমেন্ট বলবো সেসব আমরা জানি? এই ম্যাপিংটা দরকার। যেমন ধরো অটল পেনসন যোজনা, সেখানে কোন বয়সে কতটাকা প্রিমিয়াম লাগবে সেটা কে জানো? দেখা যাচ্ছে কেউ জানিনা। তাহলে কেউ যদি গ্রামসেবা কেন্দ্রে এসে জানতে চায়, সেতো

জানতে পারবে না। তাহলে আমাদের ডিজিটাল সেবাকেন্দ্র যারা চালাচ্ছেন তাদের প্রাথমিক জ্ঞান বৃদ্ধির জন্যেই প্রশিক্ষন দরকার। মায়েদের নিয়ে যখন মিটিং চলবে, বাচ্চাদের অভিভাবকদের মিটিং-এ গ্রামসেবাকেন্দ্রের কর্মী সেখানে গিয়ে খানিকটা কথা বলতে পারে। তাতে পারস্পরিক পরিচয় যেমন বাড়ে, সকলেই বিষয়গুলি জানতেও পারে। একে বলে একটা কাজের সঙ্গে অন্য কাজের কনভারজেন্স। গ্রামসেবা প্রকল্পে কোথাও বলা নেই যে একটা কাজের দায়িত্বে যিনি আছেন, তিনি সেই নির্দ্ধারিত কাজটুকুই করবেন। তারমধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবেন। বাকী কাজ সে জানবে না। তোমাদের উদ্দেশ্য হোক তোমাদের কাজটা সম্পর্কে কেবল গ্রামের লোক নয়, গ্রামের বাইরের লোকেও জানুক। ডিজিটাল সেবাকেন্দ্রে কী কী সার্ভিস পাওয়া যাবে সেটা ডিসপ্লে করা থাকবে। তোমার কাস্টমার ফেব্রুয়ারী মাসে যা ছিল, মার্চ মাসে, এপ্রিল মাসে কত ছিল? এই মে মাসে তোমার টার্গেট কত? কারণ এর সঙ্গে দুটো জিনিস যুক্ত। এক হচ্ছে সার্ভিসটা গ্রামে বসে মানুষ পাবে। দ্বিতীয় হচ্ছে তার আর্থিক দিক। কারণ লাস্ট পয়েন্টতো সাসটেইনেবিলিটি। এই তিন বা চার হাজার টাকার বেতনটা দিয়েতো সংসার করতে পারবে না। বরং ওই সেন্টারটা এমন ভাবে গড়ে তোলো যাতে তোমার নেতৃত্বে তিন চারজন তিন চারটে কম্পিউটার নিয়ে ওই কেন্দ্রে বসে কাজ করবে। তুমি নির্দেশ দেবে। তুমি সাইবার ক্যাফের মালিক হয়ে ওঠো। এটা তোমার জীবন জীবিকার আধার হতে পারে, তোমার সিকিউরিটি হতে পারে, সেই ভাবে গড়ে তোলো। সেটা নিজে নিজেই হবে, তোমার লক্ষ্য হোক সর্বাধিক সংখ্যক গ্রামবাসীকে সর্বাধিক সেবা দিয়ে যাওয়া।

এরপর দেখো। প্রকল্পে বলা হচ্ছে, কোয়ালিটি এডুকেসন ফর রুরাল স্টুডেন্ট। যারা রেমিডিয়াল টীচার আছেন। তাঁরা বলুনতো কোয়ালিটি এডুকেসন বলতে ঠিক কী বোঝায়?

জনৈক প্রশিক্ষার্থী : যথপোযুক্ত শিক্ষা।

সেটা আবার কী জিনিস? যথোপযুক্ত শিক্ষা বলতে কী বোঝায়? যে বিষয়ে তুমি শিক্ষালাভ করছো, সেই বিষয়ে কেউ যেকোন প্রশ্ন করলে সঠিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে তোমাকে বোঝাতে পারতে হবে। নাকি কোয়ালিটি এডুকেসন বলতে কত পার্সেন্ট নম্বর পেয়েছি সেইটা? যদি কেউ আশি পার্সেন্ট পেলো, স্টার পেয়েছে হয়তো, লেটার মার্ক্স পেয়েছে। সেটাও একধরনের কোয়ালিটি এডুকেসন। আরেকজন হয়তো পঞ্চাশ পার্সেন্ট পেয়েছে। কিন্তু আমার শিক্ষা আমার জীবন এবং জীবিকার ক্ষেত্রে, আরও অনেকের জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এই যে একজন এমবিএ পড়ছে। সে যদি ভবিষ্যতে কোন বিজনেস শুরু করে, তার ম্যানেজমেন্ট এ্যাডমিনিস্ট্রেসন বুঝে ব্যবসাটা পরিচালনা করবে। ব্যবসাটা বাড়াবে। নম্বর পাওয়াকে অস্বীকার করছি না। তার সঙ্গে আরও কিছু যোগ করতে চাইছি। শিক্ষাটা শুধু মস্তিষ্ক দিয়ে নিয়েছি, না হৃদয় দিয়ে

ভালবেসে গ্রহণ করেছি। সে শিক্ষার বিষয়বস্তু যাইহোক। যাঁরা আপনারা বাচ্চাদের পড়াচ্ছেন। তাতে বিষয়ের প্রতি দখল আপনার কতোটা আছে, তা যেমন বুঝতে পারছেন, তেমনি পড়ানোর সময় সেই ধ্যান, মনঃসংযোগ কতটা সেটাও বুঝতে হবে। ছাত্র ছাত্রীর সমস্যা ধরতে পারতে হবে। সব ছাত্রছাত্রীর কোয়ালিটি একরকম হবে না। কোন বিষয়ে তাদের ইন্টারেস্ট তাও জানতে হবে। পড়াশোনার সাথে সাথে কোন বিষয়ে তাদের আগ্রহ? কেউ হয়তো ভাল গান করে, গান গাইতে ভালবাসে। সে ভবিষ্যতে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় হলেও হতে পারে। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় কতদূর লেখাপড়া শিখেছেন কেউ জিজ্ঞেস করে? আমাদের কমিউনিটিতে এমন ব্যবস্থা থাকতে হবে, যে এই বাচ্চারা পড়াশোনার সঙ্গেই তাদের এরিয়া অফ ইন্টারেস্ট অনুসারে সেই ব্যবস্থাপনায় নিজেদের বাড়িয়ে তুলতে পারে। কমিউনিটিতে স্পোর্টস করা হতে পারে। ইয়ুথদের মধ্যে থেকে কেউ চ্যাম্পিয়ন বেরুতেও পারে। সেই সুযোগ থেকে একজনও যেন বঞ্চি ত না হয়। আমরা কী কর্মী আনতে চাইছি? প্রেরণা। কোথা থেকে পাবো। সেল্ফ হেল্প গ্রুপের মায়েদের মধ্যে থেকে খুঁজতে পারি। তার মানে কমিউনিটিতে স্কিল ম্যাপিং চাই। তখন কী কী ধরনের স্কিল আপগ্রেড করা দরকার বুঝতে পারা যাবে।

তাহলে এইসব ছাত্রছাত্রীরা বেশীরভাগ প্রাথমিক সেকেন্ডারি লেভেলেই আছে। তাদের একাগ্রতা, সাবজেক্ট সম্পর্কে তাদের পছন্দ এগুলো জানবো। মাধ্যমিক পাসের পরেই কেউ মানববিদ্যা বা এখন যাকে বলে আর্টস, কেউ সায়েন্স কেউ কমার্স পড়বে। তার দক্ষতা, মেধা, বুদ্ধি বৃত্তি, পছন্দ অনুযায়ী সে যাতে বিষয় নির্বাচন করতে পারে সেটাতে সাহায্য করা দরকার। যে টীচাররা পড়াচ্ছেন, সেই রেমিডিয়াল টীচারদের কি সব সাবজেক্টে দক্ষতা রয়েছে? নেই তো? তাহলে তাদের কী কী প্রশিক্ষণ লাগবে? টীচারদের কোন সহায়িকা বই, প্রশিক্ষণ, এখানকার লাইব্রেরীর সাহায্য কী লাগবে? টীচারদেরই যোগ্যতা না বাড়ালে, তারা বাচ্চাদের পড়াবে কী করে? এখানে যেসব হাইস্কুল আছে সেখানকার শিক্ষকদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া যায় কিনা দেখতে হবে। বাচ্চাদের পড়ানোর যোগ্যতা আছে কিনা। বাচ্চাদের মনযোগ আকর্ষণ করতে পারি কিনা? বাচ্চা কেন অনিয়মিত ক্লাসে আসছে? তার বাবা মা চায় না? এই সেন্টারের পরিবেশ কি ঠিক নেই? কারণটা টীচারদেরই খুঁজতে হবে। পরিচয়দান পর্বে বলেছেন সেন্টারে ২৫টা বাচ্চা আসে। এই ২৫টা বাচ্চার ম্যাপিং, তাদের এ্যাটেনডেন্সের স্ট্যাটাস কী? এডুকেসন কোঅর্ডিনেটরকে সেটা দেখতে হবে। কম্পিউটার ল্যাব, স্মার্ট ক্লাসরুম তৈরী করছি। কিন্তু আমার বাচ্চাদের কতজন ওই স্কুলে যায়, ওই ফেসিলিটি পায় সেটা জানতে হবে। নাকি কেউ পায় না; রাউতারা স্কুলে কতজন যায়? না গেলে কোয়ালিটি এডুকেসন হবে কীভাবে? লাইব্রেরী ফেসিলিটি, ল্যাব ফেসিলিটি, স্মার্ট ক্লাসরুম ফেসিলিটি তৈরী করেছি। কিন্তু আমাদের রেমিডিয়াল স্কুলের শিশুরা সেই ফেসিলিটি যেন পায় সেটা দেখতে হবে।

ওই বাচ্চাদের ম্যাপিং, টীচারদের কোয়ালিটি, কোন কোন ট্রেনিং টীচারদের দরকার। সরকারী স্কুলের শিক্ষকদের নিয়ে ট্রেনিং দিলে শিক্ষকরা থাকতে চান না। কারণ তাঁদের হয়তো সাবকনসাসে কোনো ভাবনা কাজ করে। আমি পড়াচ্ছি। ওই মাস্টারমশাই আমাদের কী শেখাবে? এগুলো হচ্ছে তাদের মাইন্ডসেট। তাঁদের বোঝাতে হবে। নিজেদের যদি আপগ্রেড করতে পারি, সেই লার্নিংটা কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। এই ম্যাসেজটা তাঁদের দিতে হবে।

এরপরে হচ্ছে সমস্ত গ্রামের সমস্ত বাচ্চা স্কুলে যায় কিনা। প্রাইমারিতে যেতো। সেকেন্ডারি স্কুলে যায় না কতোজন? গ্রামসেবা কেন্দ্র যেমন গোটা গ্রামের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে সব পরিবারকেই সার্ভিস দেবে, তেমনি আমাদের রেমিডিয়াল স্কুলের বাইরে গ্রামের তো আরও বাচ্চারা আছে। 'এডুকেসন ফর অল' বলছি যখন, সব শিশুকে স্কুলে যেতে হবে। এমনকি কেউ আছে যারা হাইস্কুলে যেতে গিয়ে ড্রপড আউট হয়ে গেছে? ড্রপড আউটের স্টেজ হচ্ছে, ফোর থেকে ফাইভে ওঠার সময়। প্রাইমারি স্কুল ছিল বাড়ির কাছে। সেকেন্ডারি স্কুল অনেকটা দূর। তখন শিশুর বয়স ১১-১২ বছর। তাকে পাট বাগানে, সব্জি বাগানে, 'ছাগল চড়াতে যা 'বলা হয়। পড়ে কী হবে? আমাদের কি চাকরী হবে? দ্বিতীয় স্টেজ হচ্ছে যখন এইট থেকে নাইনে ওঠে, তখন ড্রপড আউট হয়। তৃতীয় স্টেজের ড্রপড আউট হচ্ছে মাধ্যমিক পাস করে যখন উচ্চমাধ্যমিকে যায়। বিশেষ করে মেয়েরা। তখন মেয়েদের বয়স ষোল প্লাস। এই সিমুরালিতে কতজন মেয়ের ষোলর পরে আঠোরার নীচে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। বিয়েটা বন্ধ করার প্রথম পদ্ধতি হচ্ছে তাকে যদি এডুকেসনের মধ্যে রেখে দেওয়া যায়। অন্য কোন মোটিভেসনে হবে না। অতএব কর্মীদের কাছে এই পরিসংখ্যান থাকতে হবে। কোনটা দরকার? আরও এ্যাওয়ার নেস? আরো সেনসিটাইজেসন? আরও মোটিভেসন? সবাই কন্যাশ্রীর আওতায় থাকে যাতে। তারপরেও আরও পড়তে চাইলে পড়তে পারে। কন্যাশ্রীর ধাপ আছে। কোন ধাপে কী বেনিফিট তাকি কর্মী বন্ধুরা জানেন?

জানেন না? তাহলেই দেখা যাচ্ছে কর্মীদেরই নলেজ গ্যাপ রয়েছে। প্রিভেনসন অফ আর্লি ম্যারেজ কন্যাশ্রীর প্রথম কথা। আঠেরো বছর অব্দি সবাই লেখাপড়া শিখবে। পরবর্তী লেখাপড়ার জন্যে টাকা পাবে। তারপর চবিবশ বছর রয়সের পরে সে বিয়ে করবে। তখন রূপশ্রী প্রকল্প পাবে। তার মানে মেয়েদের সরকারী স্কিমে রেখে পড়িয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারার সুযোগ রয়েছে, সেটা পরিস্কার বোঝা দরকার। গ্রুপের মায়েদের যখন মিটিং হচ্ছে, এডুকেসন ইনচার্জকে উপস্থিত হয়ে এই বিষয়গুলো বোঝাতে হবে যে, আমিও মেয়ে। আমি মাস্টার অফ সোসাল ওয়ার্ক পড়াশোনা করে চাকরী করছি। তাহলে আপনার মেয়ে নয় কেন?

তাহলে প্রত্যেক কর্মী তাদের রোল রেসপন্সিবিলিটিটা বুঝতে পারছেন? কটা স্কুলে

এই বানিয়ে দিলাম সেই বানিয়ে দিলাম। সেটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার হচ্ছে, ঠিকাছে। কিন্তু ওগুলো বানিয়ে লাভ কি যদি আমার মানব সম্পদ তৈরী না হয়! অতএব বুঝতেই পারছেন কী কী আপনাদের করতে পারতে হবে? এইগুলোই গ্রামসেবা কমিটির মিটিং-এর এজেন্ডা হতে হবে। প্রত্যেকটা গ্রামে গ্রামসেবা কমিটি গড়ে তোলা হয়েছে। সেই মিটিং এ এসব আলোচনা হোক। গ্রামের বাইরেও এই কাজের কথাগুলো ছড়াবে। ইনফ্রাস্ট্রাকচারতো রক্ষাও হবে না, ব্যবহারও হবে না, যদি মানব সম্পদ তৈরী না হয়। মানবসম্পদ কিন্তু অন্যান্য বস্তুগত সম্পদ তার ইনফ্রাস্ট্রাকচারের থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামসেবা কমিটির সদস্য সদস্যাদের বোঝাতে হবে যে, শিক্ষিত গ্রাম গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি অন্যান্য গ্রাম তখন এইসব প্রোগ্র্যাম করতে চাইবে। আর তখনি এই নির্দিষ্ট কয়েকটি গ্রামের বাইরে এই প্রোগ্র্যাম ছড়িয়ে যাবে। রেমিডিয়াল টীচার তখন এই গ্রামের রিসোর্স টীচার হয়ে উঠবে। লোকেরা তার কাছেই নিজের বাচ্চাদের পড়াতে চাইবে। সুতরাং এডুকেশন ইনচার্জকে ম্যাপিংটা করে নিতে হবে যে কোথায় কোথায় ফ্রাস্ট্রেসন কাজ করছে। কোথায় কী ধরনের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং দরকার। কী ইনপুট দরকার। ওদের প্রত্যাশা, প্রয়োজন জেনে কাজটা প্ল্যান করতে হবে। আর সেসব করার জন্যে নিজেকে আগে মোটিভেট করতে হবে। অন্যথায় সাফল্য আসা মুস্কিল। এসব নিয়ে আপনাদের টেনসনেরও কিছু নেই। রিল্যাক্স মুডেই এসব কাজ করে ফেলা যায়।

তিন.

এখন আমরা এই গ্রামসেবা প্রকল্পের অন্য একটি উপাদান স্বাস্থ্য বিষয়ে আলোচনা করতে পারি। প্রাইমারি হেলথ কেয়ার বলতে আমরা কে কী বুঝছি। কার কী ধারণা রয়েছে আগে দেখে নেওয়া যাক। আপনাদের ধারণাটা শোনা যাক।

--- জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত স্বাস্থ্যের সবকিছুই (জনৈক প্রশিক্ষার্থী)।

--- জন্মেরও আগে থেকে, শিশু মাতৃগর্ভে থাকার সময় থেকেই মায়ের স্বাস্থ্যরক্ষা থেকে তার শুরু (অন্য প্রশিক্ষার্থী)

--- না-না এ ধারণা ঠিক নয় (আরেকজন প্রশিক্ষার্থী)

অংশুমান : প্রাইমারি স্কুল বলতে আমরা কী বুঝি? ক্লাস ওয়ান থেকে পোস্ট গ্যাজুয়েসন, মানে এম এ পাশ অব্দি শিক্ষাকে প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষা বলা হয় নাকি?

--- না, ক্লাস ফোর অব্দি প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষা (হাসতে হাসতে জনৈক প্রশিক্ষার্থী)

অংশুমান : তাহলে প্রাইমারি হেলথ কেন জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা হবে। হার্ট অপারেসন, ব্রেন অপারেসন সব কি প্রাইমারি হেলথ হবে?

--- না-না, মানুষের সাধারণ যা যা হয় জ্বর, সর্দি, কাশি এগুলোর চিকিৎসা (প্রশিক্ষার্থী)

--- আর কী?

--- পেট ব্যাথা, পায়ে ব্যাথা, হাত পা কেটে গেছে এই সব (প্রশিক্ষার্থী)

--- কারুর হাত পা ভেঙে গেছে, পুড়ে গেছে তার চিকিৎসা (প্রশিক্ষার্থী)

অংশুমান : সেগুলি হচ্ছে আপৎকালীন বা এমারজেন্সী চিকিৎসা, প্রাইমারি নয়। আমরা কি প্রিভেনটিভ হেলথ আর কিউরেটিভ হেলথ এই দুটো কথা শুনেছি?

--- শুনেছি, মানে জানি না

অংশুমান : প্রিভেনটিভ কেয়ারের মধ্যে আসবে রোগকে প্রতিরোধের ব্যবস্থাগুলি। আমাদের অভ্যাস, আচরণের পরিবর্তন। প্রাইমারি হেলথ কেয়ারের উপাদানগুলি হচ্ছে : ১। জল এবং অনাময় ব্যবস্থা। ২। পুষ্টি ৩। মা ও শিশুর স্বাস্থ্য ৪। ইমিউনাইজেসন ৫। এন্ডেমিক ডিজিজ প্রিভেনসন, ৬। সাধারণ রোগ ব্যাধির এবং ক্ষতের চিকিৎসা, মানসিক স্বাস্থ্যের প্রোমোসন ৭। দরকারী ওষুধপত্রের ব্যবস্থা ৮। রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে শিক্ষা। এই আটটি বিষয়ের মধ্যে কোনটা শক্ত কথা যা বুঝতে সমস্যা হচ্ছে?

--- অনাময় ব্যবস্থাটা কী (জনৈকা প্রশিক্ষার্থী)

অংশুমান : অনাময় ব্যবস্থা মানে (হাসতে হাসতে) যাকে সোজা বাংলায় বলা হয় স্যানিটেসন ব্যবস্থা।

--- আর এনডেমিক ডিজিজ? (জনৈকা প্রশিক্ষার্থী)

--- বিশেষ কোন অঞ্চলের বিশেষ কোন জনগোষ্ঠীর মধ্যে যেসব রোগ বাইরের কোন কারণ ছাড়াই বিস্তার লাভ করে এবং অনেকদিন স্থায়ী হয়। সোজা বাংলায় আঞ্চলিক রোগ।

প্রিভেনসন মানে রোগ হবার আগে সেটা পতিরোধের ব্যবস্থা। সেজন্যে বিহেভিয়ার, এ্যাটিটিউডে পরিবর্তন দরকার। মা গর্ভবতী হলে মায়ের ইমিউনাইজেসন, শিশু জন্মালেই তার প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্যে ৫ বছর বয়সের মধ্যে ইমিউনাইজেসন করে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়তে হয়। স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য কোনটা করা উচিত। কোনটা করা উচিত নয় সেইসব বিষয়ে শিক্ষা দরকার। গ্রামসেবা প্রকল্পে যে সঞ্জীবনী ব্যবস্থাটা আছে, তা দিয়ে প্রাইমারী হেলথ বিষয়টা আমরা সুনিশ্চিত করবো। এখানে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কিছুটা অভাব আছে শুনেছি। কিন্তু আমাদের আচরণগত পরিবর্তন ঘটালে অনেক রোগ থেকে বাঁচা যায়। যাদের কিছু ক্রনিক রোগ আছে, ডাক্তার দেখাতে পারেন না। গরীব মানুষ ওষুধপত্র কিনতে গেলে অনেক টাকা খরচ হয়, তাঁদের জন্যে সঞ্জীবনী চিকিৎসাকেন্দ্র রয়েছে এই প্রকল্পে। তাঁরা ক্লিনিকে আসবেন। কিন্তু এমবিবিএস ডাক্তারবাবু ক্লিনিক খুলে গ্রামে বসছেন। তাই গাঁ শুদ্ধ লোকের অসুখ হয়ে যাবে, ক্লিনিকের রোগীর সংখ্য বাড়বে এটা আমরা চাইছি না। প্রিভেনসনের শিক্ষা চাই। তারা জানবেন জলবাহিত বায়ুবাহিত রোগ কেন হয়। খাবার আগে হাত ধুতে হবে কেন। কীভাবে ধুতে হবে। সকালে কিছুটা হাঁটাহাঁটি করলে শরীর সুস্থ থাকবে। ক্লিনিকে আসার দরকার হবে না। কতোটা ক্যালোরী

আমাদের দরকার। কতো ক্যালোরী হাঁটাহাঁটি বা শারিরিক পরিশ্রম করলে বের হয়ে যাবে সে বিষয়টাও জানতে হবে। সহরের লোকেরা প্রচুর ক্যালোরী খাবার খায়, দৈহিক পরিশ্রমের কাজ কিছু করে না। ওদের ক্যালোরীগুলো জমে জমে শরীরে অসুখ বিসুখ হয়। আপনাদের পুষ্টিকর খাবারের অভাব আর বেশী পরিশ্রমের ফলে অন্য অসুখ বিসুখ হবে। সুতরাং পুষ্টি বিষয়টাও জেনে বুঝে ঘরের আশপাশ থেকে সস্তায় পুষ্টি কীভাবে পাবো সেটাও শিখতে হবে। এই সব বিষয়ে কর্মীদের বোঝাতে হবে মানুষকে। হেলথ মানে ডাক্তার ওষুধ নয়। মানুষকে প্রকৃত শিক্ষা দিয়ে স্বাস্থ্যসচেতন জনগোষ্ঠী তৈরী করতে হবে। গ্রামসেবাকর্মী তাদের এ্যাটিটিউড, বিহেভিয়ার পরিবর্তন করে তাকে সুস্থ রাখবেন। একবার বললে হবে না। আগামী তিরিশ মাস ধরে বারে বারে বলতে বলতে তাঁদের মাথায় দিয়ে দিতে হবে। তার সঙ্গে নিরাপদ জল আর বিজ্ঞানসম্মত অনাময় মানে বাংলায় যাকে বলে স্যানিটেসন ব্যবস্থা হলে জলবাহিত রোগ কমে যাবে।

এটা কি কেউ বলতে পারেন যে এখানকার জলে আর্সেনিক আছে কি না? জলের উৎসগুলি কী কী? রেমিডিয়াল টীচার কি জানেন যে তাঁর ছাত্রছাত্রীদের সকলের বাড়িতে টয়লেট আছে কিনা? যদি থাকে তাহলে সেটা কীভাবে ব্যবহার করতে হবে, ব্যবহারের পর কী করতে হয়? জলের ব্যবস্থা আছে কিনা, সে হাত ধোয় কিনা। এই নদীয়া জেলা পশ্চিমবঙ্গে যখন ওডিএফ জেলা হয় তখন পিবি সেলিম ছিলেন জেলা শাসক। এত বছর হয়ে গেছে। মানে সব ঘরে টয়লেট ছিল তখন। টয়লেট ছিল, কিন্তু হাতটা ঠিকমত না ধুলে হবে না তো। কর্মীরা সার্ভে করেছেন, মায়েদের সঙ্গে শিশুদের অভিভাবকদের সঙ্গে। লাইভলিহুড নিয়ে মিটিং করেছেন। কিন্তু সবার ঘরে বিজ্ঞানসম্মত টয়লেট আছে কিনা। নিরাপদ জল পাচ্ছে কিনা, জলে আর্সেনিক আছে কিনা সে খবরটা নেওয়া হচ্ছে না। বাইরে খোলা জায়গায় মলত্যাগ করলে সেটা ক্রমশ মাটির নীচের জলকে দূষিত করে। ফলে নলকুপের জলও কন্টামিনেটেড হচ্ছে। বাড়িতে টয়লেট বসালেন, টয়লেট ব্যবহারও করলেন, হাতও ধুলেন, কিন্তু টিউবওয়েলের জলের মধ্যে দিয়ে অন্যের মল আপনার পেটে চলে গেল। জল বাহিত রোগ হয়ে গেল। প্রতি মাসে চার পাঁচ হাজার টাকা চিকিৎসায় খরচ হয়। প্রতিবাড়িতে শৌচাগার থাকলে ওই টাকাটা বাঁচবে। নচেৎ কতো টাকা ইনকাম বাড়াবেন যদি সেই ইনকাম এভাবে চিকিৎসায় খরচ হয়ে যায়?

তাহলে গ্রামসেবা কমিটির লোকেরা যেন এরপর দাঁড়িয়ে সবাইকে বলতে পারে যে, আমাদের জীবন জীবিকা, জীবনযাত্রার মান, আমাদের অভ্যাস, স্বাস্থ্য, ডিজিটালাইজেসন, বাচ্চাদের কোয়ালিটি এডুকেশন এইগুলোর কাজ খুব ভাল হয়েছে। এসবিআই ফাউন্ডেসন ব্যাঙ্কিং এর বাইরেও যে সার্ভিস দিচ্ছে। সামাজিক কাজও করে চলেছে, এতে যেন সকল মানুষ আপনাদের প্রশংসা করতে পারে যে আগামীদিনে জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তন ঘটাবে। □

সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট করতে সময় লাগে, ধৈর্য লাগে, কিন্তু সম্ভব

অশোক ভট্টাচার্য

‘সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট’ কি একটা কথার কথা? এটা কি সত্যিই সম্ভব? নাকি অলীক কল্পনা? দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার মথুরাপুর দুনম্বর ব্লকের নন্দকুমারপুর অঞ্চলে প্রায় পঁচিশ বছর ধরে এই কাজেই নিযুক্ত অশোক ভট্টাচার্য। কী অভিজ্ঞতা হল তাঁর পঁচিশ বছর পরে? কী ভাবনা ছিল। কীভাবে কেটে গেল এই পঁচিশটা বছর? সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে? কী বলছেন অশোক?

সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট ঠিক কি আমি বলতে পারব না। অর্গ্যানাইজেসনের দীর্ঘ যাত্রাপথটা আমি দেখেছি। সেটা বলতে পারি। তা থেকে বোঝা যেতে পারে। গত শতাব্দীর নয়ের দশকের গোড়ায় আমি এই সবুজসংঘ সংগঠনে যোগ দিই। তখন এই ‘সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট’ কথাটাই শুনিনি। ‘সোসাল এ্যানিমেটর’ ট্রেনিং হয়েছিল। আঠাশ হাজার টাকা তার বাজেট ছিল। আমি সেই প্রশিক্ষণের অর্গ্যানাইজার ছিলাম। একজন প্রশিক্ষার্থীও ছিলাম। এরপর কাপার্ট থেকে আমরা একটা প্রজেক্ট পাই। ফিশারির প্রজেক্ট। এক লক্ষ একুশ হাজার টাকা বাজেট। সোসাল এ্যানিমেটর প্রজেক্টটিও কাপার্ট থেকে পাওয়া। এসবই ১৯৯৪-৯৫ সালের কথা। এইসময় স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দপ্তর থেকেও আমরা একটা প্রজেক্ট পাই। সেই প্রকল্পে ছিল ২৫জন এ্যানিমেটর, মানে তারা স্বাস্থ্যকর্মী, আর একজন কোঅর্ডিনেটর নিয়ে শুরু হল। প্রথমে এ্যানিমেটর প্রশিক্ষণ, আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল পরিবার পরিকল্পনা। তখন আমাদের সুন্দরবনে ভেসেকটমি বা টিউবেকটমি খুব প্রবলভাবে আসেনি। জনগণের মধ্যে এসব নিয়ে ভীতি ছিল, ভয়টা ছিল পুরুষদের, মেয়েদের কিছুটা মোটিভেসন ছিল। এই কাজগুলি করতে করতে আমাদের

একটা লার্নিং হচ্ছিল। সেটা হচ্ছে, মেয়েরা নানারকম অসুখে ভুগছে। প্রায় সকলেরই এ্যানিমিয়া আছে মানে রক্তাল্পতা যাকে বলে। পরিবারে তাদের কোন গুরুত্বই নেই। ওদের অসুবিধার বিষয়গুলো পরিবারে প্রায়োরিটি পায় না। সেটা ওদের বাপের বাড়ি যাওয়া হোক অথবা ওদের চিকিৎসার জন্যে খরচ করার বিষয় হোক, কিংবা বাচ্চাদের ছোট ছোট বায়না মেটানো হোক। ঘরের পুরুষ অসুস্থ হয়ে গেলে ইনকাম বন্ধ হয়ে যায়, সংসার চালানোর চাপ মেয়েদের উপরেই থাকে। বিশেষ করে সমাজের বিত্তহীন অসহায় পরিবারগুলোতেই এটা দেখা যায়। আমাদের চবিবশ পঁচিশটা মেয়ে কর্মীর মাধ্যমে এইসব তথ্য আসতে শুরু করলো। তখন মনে হতে লাগলো যে মেয়েরা সমাজের সবথেকে পিছিয়ে পড়া শ্রেণী। তাদের জন্যে কিছু করা দরকার, আমি তখন অন্যধরনের কাজ করতাম সংগঠনে। কিন্তু মাসিক ত্রৈমাসিক কর্মী মিটিংগুলিতে এসব খবর শুনতাম। সেটা ১৯৯৪-৯৫ সাল। শুনতাম পরিবারে মেয়েদের বাচ্চা হবার পরে বা আগে যেসব নিয়ম কানুন মানতে হয়, নিউট্রিসন পেতে হয়, সেসব কিছুর অভাব থাকে। ঘরের অন্যান্য মহিলারাও বাড়ির বৌ-এর শরীর স্বাস্থ্য বিষয়ে উদাসীন। হয়তো অজ্ঞতা থেকেই। শিশুরাও অপুষ্টিতে ভোগে। তখন মনে হল মেয়েদের হাতে পয়সা থাকা দরকার। এইসব কিছু ভাবনা থেকে ১৯৯৪ সালের ২৯ শে অক্টোবর আমরা একটা প্রোগ্রাম নিয়েছিলাম। সেটা হচ্ছে ইনডিভিজুয়াল সেভিংস্ প্রোগ্রাম ফর উইমেন। সেই বিষয়ে হাওড়া জেলার একটি সংগঠন আমাদের সংগঠনের সেক্রেটারি শ্রী অংশুমান দাসকে সহায়তা করেছিলেন। মাথা পিছু দু টাকা সঞ্চ য় করানোর কথা ছিল। তখনকার দিনে অবশ্য দু টাকার দাম ছিল। মেয়েদের হাতে দু টাকা আসাটা সম্ভবও ছিল। কারণ গ্রামের পরিবারে নানারকম ইনকাম সোর্স থাকে। বিভিন্ন ছোট ছোট ইনকাম সোর্স দিয়ে গ্রামের পরিবারগুলো টিকে থাকে। তার কিছু কিছু মহিলাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। যেমন ঘরের চাল, গরুর দুধ, গোবর দিয়ে তৈরী ঘুটেটা বিক্রি করে কিছু পয়সা তারা পায়। আমরা বলেছিলাম তোমার বাড়ি থেকেই আমাদের স্বাস্থ্যকর্মীরা এসে সঞ্চ য়ের টাকাটা নিয়ে যাবে। ঘরের পুরুষরা সেটা মেনে নেয়নি। এই দুটাকাও সঞ্চ য় হোক পুরুষরা চাইতো না। তখনো সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট ইত্যাদি কথা আমরা শুনিনি। কেবল একটা কাজ শুরু হয়েছিল নিজেদেরই ভাবনাচিন্তা থেকে। এইভাবে চলেছে ১৯৯৫ সালের শেষ অব্দি। প্রজেক্ট শেষ হল। স্বাস্থ্যকর্মীরা চলে গেলেন। তাহলে এই সঞ্চয় সংগ্রহ করার কাজটা চলবে কীভাবে?

তখন সেল্ফ হেল্প গ্রুপের ভাবনাটা তৈরী হল। ওদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে একজন দুজনকে লীডার করে দেওয়া হল। তারাই মেয়েদের সঞ্চ য় জমা করবে। যতদূর মনে করতে পারি সব মিলিয়ে আট নয়টি দল তৈরী হয়েছিল। তখন একেকটা দলে বারো তেরোজন থাকতো। এরপরে ১৯৯৬ সালে সবুজসংঘ সংগঠনটিতে একটা বড়রকম পরিবর্তন ঘটে। আগে ছিল প্রজেক্ট ভিত্তিক কাজ। প্রজেক্ট শেষ হলে, কর্মীরা ছেড়ে চলে যায়। বেনিফিসিয়ারির সঙ্গে যোগাযোগ থাকে না। কিন্তু সেল্ফ হেল্প গ্রুপ তৈরী হবার পরে

মনে হতে থাকে ওই মহিলাদের সঙ্গে নিয়মিত সংযোগ রাখা দরকার। না হলে আমাদের তৈরী মহিলাদের এই দলগুলিকে অন্যভাবে অন্য উদ্দেশ্যে কেউ পরিচালনা করতে পারে। অথবা ওরা দলভেঙে দিয়ে আবার পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়বে। সেইসময় কলকাতার একটি সংগঠনের সিরিজ অফ ট্রেনিং-এ আমাদের অংশগ্রহণের সুযোগ হয়। ডঃ দীপংকর রায়ই প্রধানত প্রশিক্ষণ দিতেন। তা থেকেই আমরা ভিন্ন ভাবে মোটিভেটেড হই। কনসেপচুাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং-এ পরিবর্তন আসে। পিপল্‌স্ পাটিসিপেটরি প্ল্যানিং প্রশিক্ষণ নিয়ে আমাদের অপারেসনাল প্ল্যানে পরিবর্তন আসে। আমরা বুঝতে পারি যে, প্রজেক্ট নয়, প্রোগ্র্যাম চালু করতে হবে। যাতে করে একটা ডেভেলপমেন্ট প্রসেস চালু হয় যেটা ধারাবাহিকভাবে এগোতে থাকে। নতুন ভাবনা দিয়েছিলেন তিনি, যেমন

ডেসটিনেসন বলেতো ডেভেলপমেন্টে কিছু নেই, সেটা আসলে একটা জার্নি। বিভিন্ন পথে বাঁক নেবে। স্পাইরাল পথে। এটা নন এন্ডিং প্রসেস। পিপল তার সমস্যা চিহ্নিত করবে। সমস্যা বিশ্লেষণ করবে, প্ল্যান করবে। তার রিসোর্স আইডেন্টিফাই করবে। পিপল স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান করবে। পিপল মনিটর করবে, মূল্যায়ণ করবে। এই পদ্ধতিটাকে আঁকড়ে ধরার জন্য সেসময় আমরা একটা বড় প্রজেক্ট রিফিউজ করি। পিপল নিজের ডেভেলপমেন্টের সমস্ত কাজটা নিজেরা করবে। তা থেকে শিখবে। তাদের নিজস্ব সংগঠন তৈরী হবে। পিপল সাসটেইনেবেল হবে। আমরা তার অংশীদার হিসেবে আমাদেরও সাসটেইনেবিলিটি তৈরী হবে। বেনিফিসিয়ারির সঙ্গে লংটার্ম রিলেসন তৈরী হওয়া দরকার। পিপল লেভেলে ইনস্টিটুসন বিল্ডিং করতে হবে, যাতে তারা তাদের ডেভেলপমেন্ট প্রসেসটাকে চালু রেখে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এই ভাবনাগুলো নিয়ে তখন আমাদের ভেতরে চর্চা আলাপ আলোচনা, আমাদের মধ্যে রিসোর্স পারসন তৈরী করা এসব শুরু হল গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে। এই প্যারাডাইম শিফ্ট হয়েছে সংঘের মধ্যে ১৯৯৬ সালের পর থেকে।

পিপলস্ ইনস্টিটুসন মানে জনগণের সংগঠন। আর একটা ডেভেলপমেন্ট অর্গ্যানাইজেসন এই দুটো সমান্তরালভাবে কী করে চলতে পারে। সে নিয়েও আমরা ভাবছিলাম। মানে পিপল্‌স্ ইনস্টিট্যুসন তৈরী হবে। তারা সক্ষম হয়ে উঠবে। তাদের আমরা গ্রোগ্র্যাম হ্যান্ডওভার করবো। আমি উইথড্র করব। পিপল তার প্রোগ্র্যামটা চালিয়ে নিয়ে যাবে। বাইরে থেকে আমরা ফেসিলিটেটর হিসেবে তাদের সঙ্গে যুক্ত থাকবো। নতুন নতুন যেসব নীড বা চাহিদা তৈরী হবে সেগুলিকে নিয়ে পুনরায় তাদের তৈরী পরিকল্পনার বাস্তবায়নের জন্যে কাজ চলবে। তখনি এই সাইকেলটা তৈরী হতে শুরু করলো। তখন প্রচুর প্রশিক্ষণ হয়েছে। হিউম্যান রিসোর্স তৈরী হয়েছে। আজকে তাদের অনেকেই নেই। আমরা তখন গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে কাজ করেছি, ঠিক দীপংকর রায়ের মতই গলা ভেঙে গেছে। তবু প্রশিক্ষণের সিডিউল বদলাইনি সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্টের কনসেপ্টটার শিকড় ছড়িয়ে পড়তে থাকলো।

সেইসব আলোচনায় একটা বিষয় উঠে এলো যে দেখো কোন ডেবেলপমেন্ট প্রসেস আইসোলেটেড মানে বিচ্ছিন্ন একটা বিষয় নয়। সেটা একটা ইন্টিগ্রেসনের মধ্যে থাকে। একটা জায়গায় ঝড় হলে একটা লোকের ঘর ভাঙে। কিন্তু শুধু ঘর ভাঙে না। তার পুরো সিস্টেমটাই ভেঙ্গে পড়ে। সুন্দরবন ডিজাসটার প্রোণ এরিয়া, আমরা ডেভেলপমেন্টের কাজ করে করে যাচ্ছি। একটা ঝড় হবে। সমস্ত ডেভেলপমেন্ট প্রসেসটাকে শূন্যতে এনে দাঁড় করিয়ে দেবে। সুতরাং তার ভেতরে যে পোটেনসিয়ালিটি আছে, সেটাকে অপটিমাম ইউটিলাইজ করে তার রিসোর্স দিয়ে তার টেকনোলজি দিয়ে তার ডেভেলপমেন্টকে দাঁড় করাতে হবে। ও যদি না চায়, তাহলে কিছুই হবে না। আমরা বাইরের থেকে সহায়ক শক্তি হিসেবে সহায়তা করতে পারি। এই পিপল সেন্ট্রিক ভাবনাটা থাকা দরকার। একটা টয়লেট তৈরী হবে। সেটা যাতে তারা জেনারেসন আফটার জেনারেসন ব্যবহার করতে পারে, সেই ব্যবস্থা থাকা দরকার। একটা টিউবওয়েল হবে। তারপর আমি যখন থাকবো না তখন টিউবওয়েলের জল খাবার লোক কি থাকবে না? সুতরাং ওয়াটসন কমিটি তৈরী করো। তাদের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করো। কমিউনিটিকে হ্যান্ডওভার করো। জলবন্ধু তৈরী করো যাতে দু-এক ঘণ্টার মধ্যে জল সাপ্লাই বন্ধ হলে ফের চালু হয়ে যায়। এভাবে সাসটেইনেবিলিটিকে ভাবা হতে লাগলো। করাও হতে থাকলো। সুন্দরবনে টিউবওয়েল করছি তার উচ্চতা কতো হওয়া দরকার। নদীর জল জোয়ারে, বানের সময় কতোটা উঠে আসবে তার উপরে প্লাটফর্ম বানাতে হবে। কারণ তাহলে ওই জলটা কন্টামিনেটেড হবে না। একটা টিউবওয়েল শুধু হেলথ হ্যাজার্ডকে কমায় না। ওদের অর্থনীতিকেও বদলে দেয়। একটা লোক যদি বাড়িতে একমাত্র রোজগেরে লোক হয়, সে অসুস্থ হলে তার ইনকাম কমে। আর খরচ বাড়ে চিকিৎসার জন্যে। তার ইনকাম কমে এক্সপেনডিচার বাড়লো মানে, সংসারের খরচ কোনও না কোনো জায়গায় কাটছাঁট হবে। তার নিউট্রিসন কার্টেল হবে। তার বাচ্চার শিক্ষার উপকরণে কার্টেল হবে। এমনকি তার মাইগ্রেসন হতে পারে। এইসব বিষয় তখন খুব ক্রিটিক্যালি আলোচনা হতে শুরু করল এবং কাজকর্মের মধ্যে ইন্টিগ্রেসনের ভাবনা এসে গেল। যাতে মানুষ মাইগ্রেট না করে এখানেই থাকে। এখান থেকেই তার জীবন জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। প্রতি পরিবার ধরে ধরে মাইক্রোপ্ল্যান হতে শুরু করল। তারই সঙ্গে অর্গ্যানাইজেসনের সাসটেইনেবিলিটির ভাবনাও চলছিল। কারণ অর্গ্যানাইজেসন নিজে সাসটেইন না করলে এসব ভাববে কে? প্রসেসটা চালিয়ে নিয়ে যাবে কে?

তখন সেল্ফ হেল্প গ্রুপগুলিকে শক্তিশালি করা শুরু হল। এসএইচজি বাড়াতে হবে, তাদের দিয়েই টিউবওয়েল, টয়লেট এসব করাতে হবে। জলবাহিত, মাছি বাহিত রোগ কমাতে হবে। এসএইচজি-র সদস্যদের খরচ কমিয়ে সঞ্চয় বাড়াতে হবে। ওদের ধীরে ধীরে ছোট ছোট ক্যাপিটেল তৈরী হতে থাকলো। আমরা বলতাম, "তোমার সঞ্চয় তোমার বর্তমান নিরাপত্তা আর সঞ্চয়টাকে বিনিয়োগ করা হচ্ছে আগামী দিনের

নিশ্চয়তা" এই স্লোগানটা আমরা নিয়ে এলাম। তোমার সঞ্চয় দিয়ে বর্তমান চাহিদা মিটছে। যদি ছোটখাটো ব্যবসায় বিনিয়োগ করো, ইনকাম বাড়বে।

কৃষিকাজের ক্ষেত্রেও ইন্টিগ্রেটেড ফার্মিং-এর বিষয় বোঝানো হতে লাগলো। তোমার ঘরে একটি মেয়ে জন্মালে পাঁচটা কাঠের গাছ লাগতে হবে। ওই গাছটা যখন চবিবশ পঁচিশ বছর হবে তোমার মেয়ের বিয়ে দিতে পারবে। মথুরাপুর দু নম্বর ব্লকের নন্দকুমারপুর পঞ্চায়েতের আটটা গ্রামে এইভাবে কাজ শুরু হল। এই পঞ্চায়েতটাই আমরা সোসাল ল্যাবরেটরি হিসেবে গড়ে তুলেছি। ধীরে ধীরে ইন্টিগ্রসন নিয়ে আসার জন্যে মানুষের মিনিমাম নীডগুলি চিহ্নিত করা শুরু হল মানুষের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে। কী কী চাহিদা মিটলে সে তার জীবনযাত্রার ভেতরে পরিবর্তন আনতে পারবে। তখন পাঁচটা থিমাটিক এরিয়া ঠিক করা হল যেগুলি এ্যাড্রেস করা হলে সাসটেইনেবিলিটি হবে। সেগুলি হচ্ছে

১। হেলথ এ্যান্ড নিউট্রিসন : সেটা টয়লেট, টিউবওয়েল, মাদার এ্যান্ড চাইল্ডের স্বাস্থ্য হতে পারে, ফ্যামিলি প্ল্যানিং হতে পারে, নিউট্রিসন প্রোগ্র্যাম হতে পারে। স্বাস্থ্য পরিষেবা হতে পারে। মানে প্রিভেনটিভ, কিউরেটিভ দুটোই থাকবে।

২। এডুকেসন এ্যান্ড প্রোটেকসন : শুরুতে মেয়েদের শিক্ষার কথা ভাবা হয়। পরে পুরো এডুকেসন এবং প্রোটেকসন হিসেবে ভাবা হল। প্রোটেকসন দরকার কারণ প্রচুর মেয়ে মাইগ্রেট করে সুন্দরবন থেকে কলকাতায় চলে আসতো। কমবয়সী মেয়েরা। যখন তারা একটু বড় হত, তাদের খরচ বাড়তো। তাদের বাড়িতে পড়া, স্কুলে যাওয়া, অন্যান্য শারীরিক বিষয় ছিল। মেয়েদের এডুকেসন প্রায়োরিটি পেতো না তাদের পরিবারে। কালো মেয়েকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিচ্ছি। একটু চেহারা ডেভেলপ করলে, চকচকে হলে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছি। সেজন্যে এডুকেসন আর প্রোটেকসন পাশাপাশিই রাখা হল।

৩। লাইভলিহুড এ্যান্ড উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট : উইমেন এমপাওয়ার বা নারীর ক্ষমতায়নের কথা ভেবেই লাইভলিহুডটা ভাবা হয়েছিল। মেয়েদের হাতে পয়সা থাকা দরকার। মেয়েরা তাদের ফ্যামিলির পয়সার গেটওয়ে হয়ে উঠুক। তাহলেই ওদের পাওয়ার তৈরী হবে। ওদের কথা বলার জায়গা তৈরী হবে। ওদের অধিকারগুলো প্রতিষ্ঠিত হবে। ওদের ফাইনান্সিয়াল পাওয়ার থাকলে ওদের কথা পরিবারের লোকজন শুনবে। ওদের মেল কাউন্টারপার্টের উপর নির্ভরতাটা কমে যাবে। তাই লাইভলিহুড এ্যান্ড উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট একটা গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্ট।

৪। ওয়াটার স্যানিটেসন এ্যান্ড হাইজিন : আমরা সেই সময় সার্ভে করে দেখেছিলাম গ্রামের মানুষ যেসব রোগে ভোগে তার বেশীটাই জল বাহিত এবং মাছি বাহিত। আর সেসবের চিকিৎসায় তাদের অনেক টাকা খরচ হয়। তাই এইটাকে পৃথক একটা সাবজেক্ট হিসেবে গুরুত্ব দেওয়া হল।

৫। এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড ডিজাসটার রেসপন্স : সুন্দরবন যেহেতু ডিজাসটার প্রোণ

এরিয়া, অনেক ডেভেলপমেন্ট হবার পরে একটা ডিজাসটার হলে সমস্তটা শূন্যে পৌঁছে যাবে। তাই মানুষকে শেখানো দরকার ডিজাসটারের আগে সে কি প্রস্তুতি রাখবে। আর ডিজাসটার হলে সে কি কি করবে। একটা হচ্ছে প্রিপেয়ার্ড নেস, একটা হচ্ছে রেসপন্স। প্রিপেয়ার্ডনেসটা এসএইচজি-কে ভিত্তি করেই শুরু হল। তাদের ইভ্যাকিউএসন রুট কোনটা হবে। তোমার বাড়ি এখানে, স্কুল কতদূরে, স্কুল থেকে যেতে কত সময় লাগে। ঝড়ের সময় কি কি জিনিস প্লাস্টিক ব্যাগে ঢুকিয়ে নিতে হবে। সে বাচ্চার ওষুধপত্র হোক বা রেসনকার্ড। এখন কার দিনে অন্যান্য সব কার্ড এসব নিয়ে কাজ করা হতে লাগলো। আবার জোয়ারে বন্যায় জলের হাইট কতোটা হবে। তার উপরের দিকে প্লিন্থ করে ঘর তৈরী করা এসব নিয়ে একটা টেকনোলজি নিয়ে আসা হল। বাতাসের গতি, টাইডাল হাইট বুঝে উইন্ডস্পীড হজম করতে পারে সেরকম কাঠামো করতে হবে। এখনো সেসব বাড়ি অনেক আছে। ২০০৯ সালে আয়লা হয়েছিল। তারপর বাড়িগুলো তৈরী হয়েছিল। আজও টিকে আছে। এইভাবে প্রত্যেক ধাপে সাসটেইনেবিলিটির কথা ভাবা হয়েছিল।

এখন স্বাস্থ্যের দিকটা বলি। স্বাস্থ্যের তিনটে দিক--- প্রিভেন্টিভ, কিউরেটিভ আর প্রোমোটিভ হেলথ। প্রোমোটিভ হেলথ নিয়ে কাজ আমরা এখনো করিনি। ওয়াটার-স্যানিটেসন নিয়ে প্রিভেন্টিভ হেলথ এর কাজটা বড় করেই চলছিল। তখন আমাদের কিউরেটিভ হেলথ নিয়েও ভাবতে হল। কারণ ওখান থেকে ১১ কিলোমিটার দূরে ছিল স্বাস্থ্য কেন্দ্র। কোন জায়গা থেকে ১৬ কিলোমিটার, কোনো জায়গা থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে। নদ-নদী-খাল পার হয়ে যেতে হবে। সবুজসংঘের সেক্রেটারি শ্রী অংশুমান দাসের মা স্বর্ণলতাদেবী সেই যুগে বিনা চিকিৎসায় মারা যান। প্রচুর পরিবার থেকে ক্রিটিকাল মাদার পাওয়া যেতে লাগলো। এ্যানিমিয়াতো একচেটিয়া। মাতৃগর্ভে শিশু উল্টো হয়ে আছে। মৃতশিশুর প্রসব কেস আসতে লাগলো। তখন ওই 'স্বর্ণলতা সবুজ সেবা সদন' নামে স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি গড়ে তোলা হল। গোল আয়ারল্যান্ড নামে একটি সংস্থা সাহায্য করেছিল। সেই সংস্থা এখন নেই। কিন্তু হাসপাতালটা রয়েছে।

এর পরবর্তীতে অনেরকম কাজ ধীরে ধীরে যুক্ত হতে থাকলো। সেল্ফ হেল্প গ্রুপ একটা বড় প্লাটফর্ম হয়ে উঠলো। তাদের অবজেকটিভগুলি সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে রিডিজাইন করতে হয়েছে। শুরুতে প্রধানত দুটি অবজেকটিভ ছিল যে, মানুষের সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা। দ্বিতীয় হচ্ছে সঞ্চয়ের সুযোগ তৈরী করে দেওয়া খরচ কমিয়ে ইনকাম বাড়িয়ে। সঞ্চয় করবে কোথায়? ব্যাঙ্কতো ১৬ কিলোমিটার দূরে। সেভিংস হ্যাবিট তৈরী হলেও সেটা করবে কোথায়? ওরা এই সংস্থাতেই টাকা রাখতে শুরু করলো। ওর টাকা আমরাই ব্যাঙ্কে জমা করব। ওর প্রয়োজনে আমি টাকা দেব। পরে তৃতীয় অবজেকটিভ যুক্ত হল। ওকে বিনিয়োগ করতে হবে। ওর হোমস্টেড জমি আছে, একটা পুকুর আছে। হাঁস মুরগী রাখার জায়গা আছে। এসব নিয়ে ইন্টিগ্রেটেড প্ল্যান করে ইন্টিগ্রেটেড ফার্ম তৈরী করা শুরু হল। চতুর্থ অবজেকটিভ যুক্ত হল, চাইল্ড এডুকেসন।

বাচ্চাগুলো মায়ের কাছেই পয়সা চাইছে, পেন্সিল, খাতা বই চাইছে। স্কুলে গিয়ে লজেন্স খাবার পয়সা চাইছে। বাবার কাছে গেলে বকুনি খাচ্ছে। সুতরাং চাইল্ড এডুকেসনটাকে মহিলাদের সেল্ফ হেল্প গ্রুপের একটা এ্যাডেড রেসপনসিবিলিটি করে দেওয়া হল। পাঁচ নম্বর অবজেকটিভ হল, যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের বিরুদ্ধে সম্মিলিত ভাবে ভয়েস রেইজ করতে হবে। প্রতিবাদ প্রতিরোধ চাই গৃহহিংসার বিরুদ্ধে। ওই মেয়েদের হাতের পয়সা জোর করে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, পয়সাটা না দিলে মারধোর করছে। কারণে অকারণে মেয়েদের উপর দৈহিক এবং মানসিক টর্চার হচ্ছে। সুতরাং ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স প্রিভেন্ট করতে হবে। তাদের অধিকার কি আছে জানাতে হবে। ভায়োলেন্স প্রতিহত করতে হবে। ছয় নম্বর হল, তাদের ক্ষমতায়ন ঘটিয়ে পলিসি লেভেলে তাদের ইন্টারভেনসন ঘটানো। মানে পঞ্চায়েতের ডিসিসন মিকিং প্রসেসে তারা যাতে অংশগ্রহণ করতে পারে। ২০০৩-২০০৪ সালের দিকে এগুলো শুরু করা হল। তারা গ্রামের পুজো থেকে মেয়ের বিয়ে থেকে পঞ্চায়েত সব জায়গায় সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে। কারণ সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতাই হচ্ছে আসল ক্ষমতায়ন। এসএইচজি মেম্বারদের ফেডারেসন তৈরী করে দেওয়া হল। মানে একটা এসএইজি থেকে একজন প্রতিনিধি এই ফেডারেসনে। এসএইচজিদের ফেডারেসন এটাই প্রথম এই রাজ্যে। পরে এটা কোঅপারেটিভ হয়েছে। মানে কোঅপারেটিভ আইনে নথিভুক্ত। নাম, সুন্দরবন মহিলা স্বনির্ভরগোষ্ঠী কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড। আগে যে দু টাকা সঞ্চয় দিয়ে শুরু হয়েছিল। পরে ওটা পাঁচ টাকা, তারপরে দশটাকা, তারপর দশের গুনিতকে টাকা সঞ্চয়। এভাবে ওখানেও একটা জার্নি তৈরী হল। একটা দল একশো টাকা বা দশ হাজার টাকা সঞ্চয় করবে, সবটা দশের গুণিতকে। এই করে ক্যাপিটেল ফরমেসন হল। লাইভলিহুডে ইনভেস্টমেন্ট শুরু হল। লেন্ডিং হল। রিটার্ন আসা শুরু হল। এখন সদস্যদের দুটো ভাগ, প্রথম হচ্ছে প্রাইমারি মেম্বার। ওয়ান স্বনির্ভর গোষ্ঠী ওয়ান মেম্বার। ওয়ান ভোটার। একটা স্বনির্ভর গোষ্ঠী একটা ভোট দিতে পারবে। একশো তিনটে এসএইচজি আছে, মানে যাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠী বলছি, তারমধ্যে প্রায় ১৯০০ মেয়ে আছে। পাথরপ্রতিমা ব্লকের তিনটে গ্রাম পঞ্চায়েতে, আর মথুরাপুর ব্লকের নন্দকুমারপুর গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে এটা চলছে। মথুরাপুর ব্লকের আরো দুটি জায়গা আমাদের অপারেসনাল এরিয়ার মধ্যে আছে, আমরা এক্সপ্যান করিনি এখনো। কোঅপারেটিভ ওই ছয়টা অবজেকটিভের উপর যা যা কাজ, তাই করছে। সেভিংস্ লেন্ডিং ইত্যাদি। প্রাইমারি মেম্বার ছাড়াও আছে নমিনাল মেম্বার। তাদের ভোটাধিকার নেই। সেভিংস করতে পারবে। ক্রেডিট নিতে পারবে না। যখন খুশি সেভিংস উইথড্র করতে পারবে। ফিক্সড ডিপোজিট, টার্ম ডিপোজিট করতে পারবে। প্রাইমারি মেম্বাররা লোনও নিতে পারবে। নমিনাল একাউন্ট হোল্ডার আছে দু হাজার মতন। এই মুহূর্তে সেভিংস আউটস্ট্যান্ডিং সব মিলিয়ে এক কোটি তেরো লাখ।

একটা সেভিংস যদি আড়াই বার ঘোরানো যায়, তাহলেই প্রোগ্র্যাম সাসটেইনেবেল হয়ে যাবে। এরকম একটা সমীকরণ আছে। তিন ধরনের লোন প্রোডাক্ট আছে। প্রথম হল বারোমাসে দশ কিস্তি। এটা শর্টটার্ম। মিডিয়াম টার্ম লোন হচ্ছে থার্টি সিক্স মান্থস্। আর একটা মেয়েদের জন্যে এমারজেন্সী লোন। সাধারণ লোন নিতে গেলে দলে মিটিং হয় রিজলিউসন হয়। ভিজিট হয়, আলোচনা হয়, তারপরে লোন এ্যাপ্রুভ হয়, টাকা দেয়া হয়। কিন্তু এমারজেন্সী লোনে এসব লাগে না। তাকে একটা কার্ড দেয়া থাকে, কার্ডটা এখানে জমা দিয়ে হাজার টাকা নিয়ে চলে যায়। যদি কারুর পাঁচ হাজার টাকা দরকার থাকে। তার দলের যদি পাঁচজন কার্ড হোল্ডার থাকে, সেই পাঁচটা কার্ড সে সংগ্রহ করে এনে জমা দিয়ে পাঁচ হাজার টাকা সে নিয়ে যায়। লোনটা তখন ইস্যু হয় ওই পাঁচজন কার্ডহোল্ডারের নামে। কেউ হয়তো গর্ভবতী, হঠাৎ লেবার পেন হল, কিংবা তার বাচ্চা অথবা স্বামী হঠাৎ অসুস্থ হয়েছে। তখন সে এমারজেন্সি লোন নেয়।

সমবায় সমিতির তিনটে ব্যবসা আছে। একটা হল, সুন্দরবন জার্মান বেকারী, পাঁউরুটি, বিস্কুট, কেক তৈরী হয়। মেয়েরাই সেটা চালায়। অনেক মেয়েরা মাইগ্রেট করে দিল্লী চলে যেতো আর সেখানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নিরাপত্তাহীনভাবে তারা থাকতো। লোকের বাড়ি রান্না করে, অনেকে মিলে একটা টয়লেট ব্যবহার করে। অসুখ বিসুখ হলে প্রচুর টাকা খরচা হয়ে যায়। এসএইচজি আমাদের এসব তথ্য দিতে আরম্ভ করলো। এসএইচজির জন্য নর্মাল ট্রেনিং হয়, তাকে ধরা যাক টেলারিং ট্রেনিং দিয়ে মূলধন দেওয়া হল, সে মেসিন কিনে ব্যবসা করবে। দ্বিতীয় হচ্ছে ট্রেনিং দিয়ে একদল মেয়েকে তৈরী করা হল, আমি প্রোডাকসন ইউনিট তৈরী করলাম, সেখানেই মেয়েরা কাজটা করে পারিশ্রমিক পেয়ে যাচ্ছে। মানে সে চাকরী করছে। কোঅপারেটিভ কাঁচামাল যোগান দিচ্ছে, উৎপাদন যা হচ্ছে কোঅপরাটিভ পুরোটা বিক্রী করছে। মেয়েরা চাকরী করে বেতন পাচ্ছে। এই দ্বিতীয় মডেলটাতেই ডঃ অমল মুখোপাধ্যায় বেকারীর প্রস্তাব দিলেন। তিনি একজন এনআরআই, কলকাতায় বাড়ি, তিনি জার্মানীতে থাকেন। একজন ইঞ্জিনিয়ার। ওনার স্ত্রী মুকুল মুখোপাধ্যায়। স্বামী-স্ত্রী এসেছিলেন। মেয়েদের জন্যে এধরনের কিছু করার প্রস্তাব দিলেন। আমরা জমি আর বিল্ডিংটার ব্যবস্থা করলাম। উনি সব মেসিনপত্রগুলির ব্যবস্থা করলেন। সেই মেয়েদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হল। ২০১৫ সালে কনস্ট্রাকসন হল, ২০১৬ সালে পাঁচ কিলো ময়দা দিয়ে প্রথম শুরু হয়েছিল। যারা কাজ করত তারা মোবাইলে গান শুনতো। গল্পের বই এনে পড়তো। ঘুমিয়েও যেতো। এখন গড়ে দৈনিক উৎপাদন সাড়ে তিন কুইন্টাল। তারা খাবার সময় পায় না। আগে চারটে প্রোডাক্ট ছিল। এখন বাইশ চবিবশ রকমের জিনিস তৈরী হয়। কোয়াটার পাউন্ড রুটি, বান রুটি আর দুরকম বিস্কিট তৈরী হত। এখনতো শুধু বিস্কিট তৈরী হয় বাইশ চবিবশ রকম। এছাড়া পাঁউরুটি, কেক, ক্রিমরোল সবই আছে। বাৎসরিক টার্নওভার এককোটি টাকার

মতন। ডিরেক্টলি এমপ্লয়ি দশজন, আর ভেন্ডিং করে সাঁইত্রিশজন। আমরা এখন প্রতিমাসে ত্রিশ হাজার টাকা স্বর্ণলতা সবুজ সেবাসদন নামে হাসপাতালকে অনুদান দেব। বছরে তিন লাখ ষাট হাজার।

জার্মান বেকারী ছাড়া 'আমার বাজার' নামে গ্রামীণ শপিংমলের মত একটা বাজার আছে। এটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর বলা যায়, শপিং মল কথাটাতে খুব একটা কর্পোরেট কর্পোরেট গন্ধ আছে। ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, মানে সরকারের 'সমবায়িকা'-র মত। চাল, ডাল, আলু, তেল, সব্জি, মুড়ি, বিস্কিট, চানাচুড়, জিরে, হলুদ, লঙ্কা থেকে জামাকাপড় পর্যন্ত সবই পাওয়া যায়। ছোট জায়গা নিয়ে চলছে। বড় করে হবে। গ্রামীণ প্রোডাক্ট যে যা উৎপাদন করছে। বিক্রী করতে চাইলে এই বাজারে নিয়ে আসবে। আমরা সেই শাকসব্জী মাছ ডিম যা চাষীর থেকে কিনলাম যেসব আমাদের ক্যান্টিন বা যেখানে যা লাগে সেটা বিক্রী করা হয়। চাষী তার সব্জি বিক্রী করে আমার বাজার থেকে ঘরের জন্যে সরষের তেল কিনলো, জিরে, হলুদ কিনলো, সেগুলো তার ঘরে তৈরী হয় না। এরপরেও দেখা গেল হয়তো ওর একশো টাকা বেঁচে গেছে। সেই টাকাটা ওর নামে ও দেবীদির কাছে জমা দিয়ে চলে গেল। ওর সেভিংসে জমা হল। ও যদি লোন নিয়ে থাকে, চাইলে ও সেই একশো টাকা পরে পরে শোধ করে দিতে পারবে। যদি ওর লোন না থাকে, তখন সেভিংসের জমা টাকাটা টার্ম ডিপোজিটে কনভার্ট করে দেবে। সেই অনুসারে সুদ পাবে। ওটা তাদের জিনিস ওরাই বেচবে। ওরাই কিনবে। এখনো ওটা পুরো সাসটেইনেবেল হয়নি, দুটো স্টাফ আছে। বাইরে থেকে সাপোর্ট নিতে হচ্ছে না। এটা সাসটেইনেবেল হতে একটু সময় লাগবে। হয়ে যাবে।

এছাড়া একটা টেলারিং ইউনিট করা হয়েছে। তারা প্রোডাকসন ইউনিটে চাকরী করে। প্রোডাকসনটা সবুজ সংঘের বিভিন্ন জেলার শাখায় চলে যায়। এটাতেও এখনো একটা ভর্তুকি দিচ্ছে সবুজ সংঘ। একটা ব্যবসা করতে তিনটে ক্যাপিটেল লাগে। একটা হচ্ছে কাঁচামাল মজুত রাখার জন্যে। একটা উৎপাদিত সামগ্রী বাজারে পড়ে থাকবে ক্রেডিট হিসাবে। আর একটা মার্কেটে পারচেজের জন্যে। এই তিনটে ক্যপিটেল লাগে। এই তিনটে এখনো ঠিকমত সার্কুলেট করা যাচ্ছে না। ক্রেডিট বেশী হয়ে যায়। যাকে বিক্রি করতে দিয়েছি, সে ঠিক সময়ে বিক্রী করতে পারেনি, সময়মত টাকা দিতে পারলো না। ফলে কিছু কিছু ছোট প্রবলেম হয়। কিন্তু সমবায় সমিতি সাসটেইন করে গিয়েছে। প্রতিমাসে ছেচল্লিশ হাজার টাকার বেশী শুধু বেতন দিতেই খরচ হয়। নিজেদের আর্নিং থেকে। কোন ডোনেসন কোন জায়গা থেকে নিতে হয় না। ফলে দেখা যাচ্ছে সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট সম্ভব। একটা সময় ছিল ডেভেলপমেন্ট এ্যাকটিভিটিটা ফান্ডিং এজেন্সী নির্ভর ছিল। এখন এইভাবে সাসটেইনেবেল বিজনেসগুলো হবার ফলে, ডেভেলপমেন্ট এ্যাকটিভিটিতে সে কন্ট্রিবিউট করছে। আজকে যদি আড়াই বা তিন লাখ

টাকা বছরে অনুদান দেওয়া হয় কোন কাজে, সেটাও তো সাসটেইনেবিলিটিরই অংশ। আজকে সমবায় সমিতিতে নয় জন ছেলেমেয়ে কাজ করে। তাদের রোজগার সাসটেইন করল কি করল না, বেকারিতে ১০ জন কাজ করে, ৩০ জন ভেন্ডার কাজ করে। তাদের এই কাজ সাসটেইন করল কি করল না? পেটিকোট প্রোডাকসনের ক্ষেত্রে যারা উৎপাদন করছে, যারা বিক্রি করছে দোকানদার, এসএইচজি, তারা প্রফিট মার্জিন পাবে কি পাবে না? আমার বাজারে দুজন কাজ করছে, এইগুলো হচ্ছে সাসটেইনেবিলিটির ইন্টারনাল দিক। কমিউনিটি লেভেলে একজন কয়েকটা পেটিকোট নিয়ে বের হল, বিক্রি করে তার পাওনাটা পেয়ে গেল। এই স্তরে অর্থনৈতিক স্থায়ীত্ব, জনগণের অংশগ্রহণ বা পার্টিসিপেসনের স্থায়ীত্ব, অর্গ্যানাইজেসনের যে পিললস্ ইনস্টিটুসন বিল্ডিং সেটারও স্থায়ীত্ব তৈরী হচ্ছে। সুতরাং সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট বা সুস্থায়ী বিকাশ ঘটাতে গেলে তার বিভিন্ন স্তর আছে। বিভিন্ন পর্যায় আছে। সেটা সবস্তরে সব পর্যায়েই ঘটাতে হবে। সেজন্যে যথেষ্ট সময়, ধৈর্য, ভাবনা চিন্তা বিচার বিশ্লেষণ লাগে। হুট করে কোন ডোনার এজেন্সী একটা তিন বছরের প্রজেক্ট শুরু করল আর ভাবলো সেই তিন বছরে সেই প্রজেক্টের কাজগুলো সুস্থায়ী হযে যাবে, সেটা অলীক কল্পনা, ইউটোপিয়া। কারণ মনে রাখতে হবে যে, এদেশে হাজার হাজার বছর ধরে নিরক্ষরতা, অর্দ্ধশিক্ষা, অপুষ্টি, কুসংস্কার, পারস্পরিক পরশ্রীকাতরতা, ছিদ্রান্বেষি মনোভাব, এইসব হচ্ছে সাসটেইনেবেল। অবৈজ্ঞানিক চিন্তা, ধর্মীয় সংস্কার ভীষণ সাসটেইনেবেল। ক্ষুদ্রস্বার্থের জন্যে তাৎক্ষণিক সামান্য লাভের জন্য বৃহৎ স্বার্থ জলাঞ্জলি দেওয়ার দুর্বুদ্ধি খুব বেশী সাসটেইনেবেল। অর্দ্ধশিক্ষিত মানুষজনের জ্ঞানী জ্ঞানী ভাবভঙ্গী করে নির্বোধের মতন কথাবার্তা বলে সবকিছু পন্ড করে দেবার উদ্যোগ হচ্ছে সাসটেইনেবেল। সেই পরিস্থিতির মধ্যে সিভিল সোসাইটি অর্গ্যানাইজেসনকে প্রকৃত সাসটেইনেবিলিটির উদ্দেশ্যে কাজ করতে হলে সেই চ্যালেঞ্জ, তার সেই লড়াই দিতে হয়, যন্ত্রণায় প্রতিমুহূর্তে ভিতরে ভিতরে রক্তাক্ত হয়েও বিরুদ্ধ স্রোতের সঙ্গে লড়াই, এগুলো সহজে কারুকে অনুভব করানো যায় না। যারা নিজেরা গরীব, অনভিজ্ঞ, সরলভাবে সবাইকে মেনে নেয়, সেই যে জনগণ, তারা ভয় পায়। সেই দুঃখি মানুষের সঙ্গে রোদে পুড়ে জলে ভিজে, কাদায় পা ডুবিয়ে ঘুরে ঘুরে হাতে কলমে কাজ করেননি যারা, রেডিমেড একটা প্রতিষ্ঠানে ঢুকে চাকরি করেন তাঁদের পক্ষে অনুভব করা মুস্কিল যে সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্টের কোন শর্টকাট পদ্ধতি নেই। এলাম। দেখলাম আর পিছিয়ে থাকা শ্রেণীর সুস্থায়ী বিকাশ ঘটিয়ে দিলাম, সেরকম হয় না। তাই সরকারী অফিসার কিংবা নেতা নেতৃ অথবা দাতা সংস্থার প্রতিনিধি যিনিই হোন, তাঁদেরও জীবন সত্যটা উপলব্ধি করতে পারা চাই। □

আগেকার দিনের নেতাদের উপলব্ধির গভীরতা আজ নেই

অরুনাভ দাস (সোশ্যাল অ্যাকটিভিটিস্ট)

সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট মানে, টেকসই বা সুস্থায়ী ডেভেলমেন্ট। সুস্থায়ী উন্নয়ন। সেটা প্রজেক্ট মোডে যদি হয় তাহলে প্রজেক্ট শেষ হবার পরেও কন্টিনিউ হতে হবে। সেটা পার্টিকুলার কোনো জেলায় হতে পারে। যদি সেটা চলতে থাকে তাহলে সেটাকে সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট বলা যায়। এর কতকগুলো ভাগ করা যায়। যেমন পরিকাঠামোগত উন্নয়ন। মানুষের আর্থসামাজিক বিকাশের পক্ষে যে কাজ, সেই কাজগুলোর মধ্যে দিয়ে একটা পরিবর্তন শুরু হবে, মানে তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন বা পরিকাঠামোগত উন্নয়ন হবে এবং সেটা চলতে থাকবে বছরের পর, জেনারেশন আফটার জেনারেশন চলতে থাকবে। সেই প্রসেসটাই সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট।

মানুষের যদি মানসিক বিকাশ হয় সত্যি করে, তাহলে মানুষ যে কোনো ধরনের প্রলয় ধবংসের মুখোমুখি হলেও সে পুনরুদ্ধার বা পুনর্জীবন ফিরে পেতে পারে। সেই প্রচেষ্টা সে চালাবে। এটা টাইম আনলিমিটেড। ডেভেলপমেন্টের শেষ হয় না। উন্নয়নের কোনো শেষ নেই। যে মানুষ খেতে পাচ্ছে না, আশ্রয় নেই, শৌচাগার নেই। ইনকামের কোনো রিসোর্স নেই, আমরা তাদের নিয়ে কাজ করে তার প্রাথমিক চাহিদা পূরণ মানে খাদ্য বস্ত্র বাসস্থানের চাহিদা পূরণ যাতে সে করতে পারে, এবং তার পরবর্তী উন্নয়ন মানে সে হয়তো একটা ভালো পরিবেশ চাইতে পারে স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্যে, বা শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য, মানে ক্রমশ ক্রমশ সে উপরের দিকে বা উচ্চবিত্তদের চিন্তা ভাবনা যেমন হয়! একটা ব্যবসা করছে আরো ব্যবসাটা বাড়াতে চাইছে, সেইরকম করে ধীরে ধীরে সে উন্নতি করতে চাইবে এবং করতেই থাকবে। সেইটাকে একটা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বেঁধে রাখা যায় না। চার দশ বছর পনেরো বছর বা একশো বছর হতে পারে। ডেভেলপমেন্টের প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, টার্সিয়ারি এরকম স্তর বিন্যাস করা হলে দেখা যাবে প্রাইমারি স্তরে সে খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে চায়, সেকেন্ডারি স্তরে সে স্বাস্থ্য শিক্ষা চাইবে এবং সেটা

পাবার উদ্যোগ নেবে। সেটা পাবার পরে সে আরো উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা চাইবে। মানুষের ভিতর থেকেই এটা আসে যে আরো বড় হবো, আরো বেশি তাকে পেতে হবে। আরো উন্নত সব নানা রকম ব্যবস্থাপনার সঙ্গে নানারকম পরিষেবার সঙ্গে সে যুক্ত হবে, এটা তার ভিসন মিশন গোল অবজেকটিভ যাই নাম দিই, এটা মানুষ মাত্রই থাকবে। একটা চাহিদা পূর্ণ হলে আরেকটা চাহিদা তৈরি হবে। একটা গোল বা লক্ষ্য পূরণ হলে আরেকটা লক্ষ্য তার সামনে আসবে, এটাই চলমান গতিশীল জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ। সে থামতে জানে না।

তাহলে আসলে যেটা দাঁড়াচ্ছে যে, একটা স্মার্ট (SMART) পরিকল্পনায় স্পেসিফিক, মেসারেবল, এ্যাচিভেবল, রিয়ালিস্টিক আর টাইম বাউন্ড--- এই যে টি তে টাইম বাউন্ড কথাটা, এটা একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পৌঁছতে নির্দেশ দিচ্ছে সে কথা ঠিক। কিন্তু সেই লক্ষ্যে এই নির্দিষ্ট টাইমে পৌঁছানোর পর তার সামনে নতুন লক্ষ্য তৈরি হবে। অর্থাৎ সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্টের 'এটাই বেদবাক্য' বা এটাই সাসটেইনেবিলিটির ডেফিনেশন, এটাই সাসটেইনেবিলিটির প্যারামিটার এরকম কিছু আছে বলে আমি জানি না। এখনো পর্যন্ত এক এবং অদ্বিতীয় কোন প্রেসক্রিপশন নেই যে সেটাই সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট। যে এইটা হলে সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট হল বা এই পর্যন্ত হলে একটা ব্যক্তি বা কমিউনিটি সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্টের শীর্ষে চলে গেল এরকম কোনোকিছু হয় বলে আমার জানা নেই। সারা পৃথিবীতে এতগুলো দেশ, তার মধ্যে কোনো একটা দেশের নাম করে বলা যাবে না যে এরা যেভাবে ডেভেলপমেন্ট ঘটিয়েছে, সেটাই সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট মডেল হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। সেরকম কোনো উদাহরণ নেই আমাদের সামনে। তারমানে সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্টে হচ্ছে সেই মানুষের সামনে রুটি ঝোলানো। যে তুমি এতদূর গেলে ডেভেলপমেন্ট হবে। মানুষ দৌড়ে দৌড়ে চলেছে ওই দূরত্ব অতিক্রম করবে বলে, তার নিজের ডেভেলপমেন্ট আর তার পরিবারের ডেভেলপমেন্টর জন্যে। ওইখানে যখন সে পৌঁছালো, দেখলো ততক্ষনে তার আশা আকাঙ্খা বদলে গেছে। তার আরো চাই। আসলে সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট বলে কতকগুলো কেক তার সামনে সেট করা আছে। যেটা মানুষকে সামনে এগিয়ে যাবার জন্যে খিদে তৈরি করবে। তার মনের মধ্যে ইনজেক্ট করা হবে যে তুমি এইটা পেতে পারো। এই কেকটা তোমার অধিকার। তোমাকে অর্জন করতে হবে। তার অভীষ্ট লক্ষ্য তখন হয়ে যাবে সেই কেকটা কিছু বছরের চেষ্টায় সে অর্জন করবে। খাবে, তখন তার মন ভরবে না। সে তখন বিরিয়ানির লক্ষ্য স্থির করবে এবং সে যাতে নিয়মিত বিরিযানি খেতে পায় সেই জন্যে দৌড়বে। প্রথমে ছিল রুটি ঝোলাবে তারপর কেক, তারপর বিরিয়ানীর হাঁড়ি এরকম জীবনভোর চলতে থাকবে। কোন স্তরটাকেই বলা যাবে না যে এই পর্যন্ত তার পাবার ছিল, ওইখানে তার ডেভেলপমেন্ট

শেষ। আর তার কিছু পাবার নেই।

যেমন একটা ভিন্ন উদাহরণ নেওয়া যাক। আমরা যখন ছাত্র অবস্থায় মাস্টার অফ সোশাল ওয়ার্ক পড়ছিলাম। তখন থেকে একটা কথা শুনেছি। সেটা হচ্ছে জেন্ডার, জেন্ডার, জেন্ডার পার্টিসিপেসন। বড় হয়ে পাসটাস করে যখন প্রজেকটের দায়িত্ব নিচ্ছি সেই একই কথা শুনছি জেন্ডার পার্টিসিপেশন। জেন্ডার ব্যালান্স ইত্যাদি। এখন দেখতে পাচ্ছি মহিলাদের অংশগ্রহণ, বা তাদের পার্টিসিপেশন হলেই কি জেন্ডারের ব্যালেন্স হচ্ছে? হচ্ছে না। কোন ধরনের মহিলার পার্টিসিপেশন হবে? ৩০ শতাংশ মহিলার পার্টিসিপেশন এনসিওর হলে নাকি জেন্ডার ব্যালেন্স হবে। যারা পার্টিসিপেট করছে তারা শারিরিকভাবে অংশগ্রহণ করল। কোনো কিছুই কন্ট্রিবিউট করল না। তাহলে সেই পার্টিসিপেশনটা শোকেস হল, প্রজেক্টের অবজেকটিভ পূরণ হল, গোল এ্যাচিভ করা গেল কি? মহিলাদের ওই পার্টিসিপেশনটা শুধু শারিরিক ভাবে উপস্থিতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল কেন? তাদের কন্ট্রিবিউসন হল না কেন?

ধরা যাক মহাকাশ বিজ্ঞান নিয়ে একটা কর্মশালা হচ্ছে, মহাকাশ বিজ্ঞানীরা আছেন, নভোশ্চর আছেন এবং আমি শ্রীযুক্ত অরুনাভ দাসও সেখানে শারিরিকভাবে উপস্থিত আছি। আমি কি সেখানে পার্টিসিপেট করে কন্ট্রিবিউট করতে পারব? পারবো না, চুপ করে বসে থাকব এবং এর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে তাদের কথাবার্তা শুনব, কিছুই হয়তো বুঝতে পারব না, সেখানে আমার পার্টিসিপেশনটা তখনি অর্থপূর্ণ হবে, যখন আগে থেকে মহাকাশ বিজ্ঞান সম্পর্কে আমাকে ইনফর্ম করা থাকবে। তাকে তখন বলা হবে 'ইনফর্মড পার্টিসিপেশন'। সেটা পার্টিসিপেটরি এ্যাকসন রিসার্চ মডেলে দেখা যায়। কোন পরিকল্পনার সময় কমিউনিটির 'ইনফমর্ড পার্টিসিপেশন' ঘটানো হয়। কিন্তু পার্টিসিপেটরি রুরাল এ্যাপ্রাইজাল' মডেলে সেই 'ইনফমর্ড পার্টিসিপেশন হয় না। রবার্ট চেম্বার্স সাহেবের মত হল, গ্রামের মানুষ সব জানে, তুমি তাকে কোনো কিছু জানাতে যেও না। এখন বেশিরভাগ প্রকল্পে রবার্ট চেম্বার্সের পিআরএ মডেল অনুসরণ করতেই বলা হয়। ফলে এই মহিলাদের পার্টিসিপেশন হয়। কন্ট্রিবিউসন হয় না। সংখ্যাগত ভাবে পার্টিসিপেশন হয়ে যায়। প্রকল্পের অবজেকটিভ এ্যাচিভ হয়, গোল এ্যাচিভ হয় না। কারণ গোলটা হচ্ছে মহিলাদের ডেভেলপমেন্ট বা বিকাশ। সেটা হচ্ছে না। সেইজন্যে এসবই ওই রুটি ঝোলানো, তারপর কেক ঝোলানো, তারপর বিরিয়ানীর হাঁড়ি ঝোলানোর মতন হয়ে থাকে। এবার যাঁদের ডেভেলপমেন্ট নিয়ে প্যাশন রয়েছে, তাঁরা ওই সেট করে দেওয়া কতকগুলো গোল এ্যাচিভ করার জন্যে পাগোলের মতন ছুটছেন। পাহাড়টার উপর তিনি যখন উঠছেন, পাশের পাহারটা দেখা গেল আরো ২০০ ফুট উঁচু। তখন তিনি পাশের পাহাড়টায় উঠতে শুরু করেন। এটাই কন্টিনিউয়াস প্রসেস, এন্ডলেস জার্নি।

তার মানে ওই এন্ডলেস জার্নিতে মানুষকে সামিল করে তুলছি আমরা, এটা কিন্তু

মূল্যবোধ সমৃদ্ধ। পারস্পরিক সহযোগিতার মূল্যবোধ সমৃদ্ধ পজিটিভ প্রতিযোগিতাও বটে। পরস্পরকে সহযোগিতা করতে করতে সকলে মিলেই এগিয়ে চলা। প্রথম পাহাড়ের চূড়ায় কেউ দুদিন আগে, কেউ দুদিন পরে পৌঁছবে। কিন্তু পৌঁছবে সকলেই যদি সহযোগিতার মূল্যবোধ নিয়ে সকলের অংশগ্রহণ থাকে, ইনফর্মড পার্টিসিপেশন হয়।

এখন মনে হতে পারে, এই এন্ডলেস উন্নয়নের দৌড় প্রতিযোগিতায় আরো চাই, আরো চাই করতে করতে সে দৌড়চ্ছে এটা মানুষের মধ্যে ভোগবাদ জাগিয়ে তোলা হচ্ছে কিনা?

এই যে কোন সরকার মানুষকে ঘরবাড়ি তৈরির জন্যে দান করছে, কোন সরকার বিনে পয়সায় চাল দিচ্ছে ঘরে বিদ্যুৎ দিচ্ছে, জলের লাইন দিচ্ছে, এটা দিচ্ছে সেটা দিচ্ছে। এইগুলো পাওয়াটাকে সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে আমরা বলবো না, সে যখন সেগুলো নিজের পরিশ্রমে নিজের শিক্ষায়, নিজের দক্ষতায় অর্জন করবে, তখন সেগুলো সাসটেইনেবল হবে। তার মানে মানুষ যদি নিজের দক্ষতায় নিজস্ব পরিশ্রমে অর্জন করে, সেটা লোভ বা ভোগবাদ নয়। সেটাই তার সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট। তার ওইগুলো অর্জন করতে গিয়েই সে শিখে নেবে যে অপচয় করতে নেই, নষ্ট করতে নেই। প্রকৃতির সম্পদের উৎসকে বাঁচাতে হবে। না হলে পরবর্তীকালে সে পাবে না ইত্যাদি। কিন্তু সে কিছুই করল না। জানল না, শিখল না। বাড়িটা, জলটা, আলোটা, খাবারটা পেয়ে গেল সরকারের ওয়েলফেয়ার ইকনমিক পলিসির কারণে, সে পাওয়া জিনিসগুলো নষ্ট করবে। সঠিক ব্যবহার করবে না, অপচয় করবে। ফলে সাসটেইন করবে না। সে যদি বাড়িটা পাবার জন্যে একটা রাজনীতির সমর্থক হয়, চালটা পাবার জন্য আরেকটার সমর্থক হয়, সেগুলি কি তার অর্জন হল? সেগুলো তার অর্জন নয়। তাকে অর্জন করতে সহায়তা করাটা আমাদের কাজ হতে পারে। যেমন আমি রান্না করতে পারি না, আমার মা আমার রান্নাটা করে দেন, থালায় সাজিয়ে আমার মুখের সামনে নিয়ে আসেন। কিন্তু আমার হয়ে তিনি খাবারটা খেয়ে নেন না। বা যদি খেয়ে দেন, তাতে আমার ডেভেলপমেন্ট হয় না। ইংরেজি ভাষায় একটা প্রবাদ আছে, যে ঘোড়াকে আমি জলের কাছে নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু জল তাকে নিজেকেই পান করতে হবে। আমি ঘোড়াকে জলপানে বাধ্য করতে পারি না। এইটা আসল পদ্ধতি। মানুষের ডেভেলপমেন্ট তাকে নিজেকেই ঘটাতে হবে। আমি তার জন্যে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে পারি মাত্র। তার ডেভেলপমেন্ট সে নিজে চাইবে তবে ঘটবে, তবে সাসটেইনেবেল হবে।

মনে রাখতে হবে বিষয়টা শুধু অর্থনীতি নিয়ে নয়। আমি মাসে কতটাকা আয় করলাম, সেটা আমার ডেভেলপমেন্টের মাপকাঠি হতে পারে না। একটা সময়ের পরে আমার যাবতীয় প্রয়োজন সেটা মিটতে থাকবে কারুর সাহায্য ছাড়াই এই অবস্থায় পৌঁছাতে হলে, নানারকম ধরনের ডেভেলপমেন্ট হতে হবে। জ্ঞান, দক্ষতা, চেতনা, মূল্যবোধ এইসব

কিছুর। বিশেষ করে মূল্যবোধের বিকাশ।

এই সবগুলোর বিকাশের জন্য একজন একজন করে তো হয় না, তাদের সংগঠিত করে সংগঠনের চেহারায় নিয়ে আসা দরকার হয়। তারপর তাদের নানাধরনের দক্ষতা সৃষ্টির উদ্যোগ তৈরি করতে হয়। চেতনার বিকাশ, মূল্যবোধের বিকাশের জন্য নানারকম কর্মসূচী গ্রহণ করে তার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নিয়ে যেতে যেতে তাদের মধ্যে নেতৃত্বের বোধ তৈরি হয়। এটা দীর্ঘ প্রক্রিয়া, ধৈর্য্য লাগে, কিন্তু সম্ভব।

একজন হয়তো রাজমিস্ত্রির কাজ করে। আগে কর্নিক দিয়ে করত। এখন নতুন টেকনোলাজি এসছে। এইটা তখন তাকে শিখতে হবে, অন্যথায় সে পিছিয়ে পড়বে। একজন লোক বানরের মতন করে নারকেল গাছে উঠতো। বিশেষ টেকনোলজিতে সে একজায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই গাছে উঠতে পারে। তাহলে সেই টেকনোলজি তাকে পেতে হবে। সময়োপযোগি টেকনিক্যাল স্কিল, জ্ঞান তাকে পেতে হবে।

সংগঠন তৈরি করার সময় খেয়াল রাখা দরকার যে সংগঠনেও বিভিন্ন স্তর থাকে। পৃথিবীর সব ধরনের সংগঠনে দুই তিন চার পাঁচ ধরনের স্তর থাকে, তার থেকে অনেক বেশিও থাকে। সব স্তরেই সেই নির্দিষ্ট স্তরের প্রয়োজন মোতাবেক জ্ঞান দক্ষতা বাড়াতে হবে। একজন একজন করে আলাদা আলাদাভাবে হবে না। আবার এককের জ্ঞান আহরণ এবং সমষ্টির জ্ঞান আহরনের মধ্যেও কম্বিনেশন চাই। জ্ঞান অভিজ্ঞতার একসচেঞ্জ হওয়া দরকার। মানুষের দুটো হাত যদি সমান্তরালভাবে না চলে, দুটো পা যদি সমানভাবে কার্যকরি না হয়, তাহলে ব্যালেন্স থাকে না। সেইজন্যে সংগঠনে প্রতিটা স্তরের কর্মীর সমানভাবে দক্ষতা সৃষ্টি দরকার। তাদের গ্রহণ এবং ধারণ, স্মরণ ক্ষমতার, প্রয়োগ ক্ষমতার তারতম্য থাকবে। তাই সকল কর্মীর সমান অর্জন হবে না, কিন্তু পার্থক্যটা উনিশ বিশ হোক। উনিশ আর উননববুই হয়ে গেলেই সমস্যা। সংগঠনের সব থেকে বড় শক্তি হচ্ছে মানব সম্পদ। একেকজনের একেকরকম দক্ষতা থাকে। কেউ ভালো লেখে, কেউ ভালো বলে, কেউ ভালো করে, কেউ ভালো হিসাব করে। ওই ভালোগুলোর সমন্বিত রূপ দরকার। কোন একটা বা দুটো ভালো দিয়েই সংগঠনটা চলবে না। আবার তার মধ্যে কেউ যদি থাকে যে কোনোটাই ভালো পারে না, কিন্তু অন্যান্য কিছু কারনে সে গুরুত্ব পেয়ে যায়। তখন যারা ভালো পারে, তারা ওই অন্যান্য কারণগুলিকে নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়তে পারে। কারণ প্রত্যেকের নানারকম ইগো থাকে সেই অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি কারণ হয়তো দেখা যাবে সে খুব পুরানো কর্মী, সংগঠনের শুরু থেকে যুক্ত হয়ে আছে। চল্লিশ বছর আগে ধবজাটা ধরেছিল। নতুন যারা পরে এসেছে, অনেক কিছু পারে। এবার এই পুরানো কর্মী সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্টর যাত্রায় ধবজাধারী হিসেবে ওই পুরাতন কর্মী ধবজাটা ধরে আছে বলে তাকে নিয়ে চলতেই হবে, তখন নতুন আসা কর্মীরা কী করবে? এটা রাজনৈতিক সংগঠনে খুব দেখা যায়। সেখান থেকে অনেক কিছু শিখবার

থাকে। বামপন্থী সংগঠনে পুরাতনরা নতুনদের এই কারণে জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন এমন দেখা গিয়েছে। সেইজন্যে সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্টের লক্ষ্যে, তার যাত্রায় যারা সামিল, সেই কর্মীদের যোগ্যতা, দক্ষতা বাড়িয়ে তোলা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

মজার বিষয় হাজার হাজার বছর ধরে যে প্রতিষ্ঠান, যে সংস্কৃতি আজও পৃথিবীতে টিকে আছে তারমধ্যে নাম করতে হলে বলতে হবে গীর্জা বা চার্চ। এই প্রতিষ্ঠান বহুবছর পৃথিবীতে রয়েছে। তিববতে বা সিকিমে বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলিও রয়েছে। এছাড়া প্রাচীন সাংস্কৃতিক ধারাগুলির মধ্যে মায়া, আজটেক, মিশর, গ্রীস, চীন, ভারত প্রভৃতি সংস্কৃতির দিকে তাকালে দেখা যাবে ভারতীয় সংস্কৃতি অন্যান্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ধারা থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করে স্ফীত হয়েছে, কিন্তু হারিয়ে যায়নি। অন্যান্য ধারাগুলিকে পশ্চিমী সভ্যতা সংস্কৃতির আধুনিক ধারা সম্পূর্ণভাবেই গ্রাস করতে পেরেছে। আজকে গ্রীক সভ্যতা সংস্কৃতি বলে কিছু নেই, মিশরীয় প্রাচীন সভ্যতা সংস্কৃতি বলেও কিছু নেই। ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় আজও হরপ্পা সংস্কৃতির ধারা দেখতে পাওয়া যায়। অন্ধ্রপ্রদেশের কিছু গ্রামে প্রাচীন সংস্কৃতি চালু আছে, ভারতে জন্ম থেকে বিবাহ, মৃত্যুর পরবর্তী ক্রিয়াকর্ম সবই প্রাচীন রীতি মেনে চলছে। তাহলে এই টিকে থাকার সবটাই ধর্মের শক্তির জোরে টিকে আছে। এখনো ক্যালেন্ডারে একটা তারিখে রথযাত্রা লেখা থাকলে সেইদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ পুরীতে ছুটে এল। কারুকে গাড়িভাড়া করে নিয়ে যেতে হয় না। খাবার দিতে হয় না। নিজেরাই খরচ করে যায়। তাহলে সত্যি করে সাসটেইনেবেল হবার শক্তিটা ঠিক কোথায়? রাজনৈতিক দলের সভায় গাড়িভাড়া করে লোক নিয়ে গিয়ে জমায়েত করতে হয়। সিভিলসোসাইটিকে একটা ছোটো মিটিংএ লোক জমায়েত করতে হলেও খাবার দাবার গাড়িভাড়া দিতে হয়। কিন্তু কুম্ভমেলা বা গঙ্গাসাগরে মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ করে। এই স্বতঃস্ফূর্ত পার্টিসিপেশন কোন অন্তর্নিহিত শক্তিতে ঘটে যার ফলে, তারা হাজার হাজার বছর ধরে সাসটেইন করছে। এটা ভাবার মত বিষয়।

মানুষের মনে ভয় বলে যে বস্তুটা আছে সেটাই এই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের একটা কারণ হতে পারে। তার পরজন্মের ভয় থাকে। পাপের ভয় থাকে, স্বর্গের বদলে মৃত্যুর পর নরকে যাবার ভয় থাকে। কেউ মনে করতে পারে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলে পাপমুক্ত হবে। কেউ গঙ্গাসাগরে পূণ্যস্নান করে স্বর্গলাভের চিন্তা করতে পারে কিংবা রথের দিন জগন্নাথ দর্শন করে ভবিষ্যতে আরো ভালো থাকার চিন্তা করতে পারে। হরিনাম জপ করেও সারাজীবনের সমস্ত পাপ ধুয়ে যাবে এটাও অনেকে ভাবেন। মানুষের মনের মধ্যে তার অজানা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে ভয়, যে ভাবনা শত শত সহস্র বছর ধরে ঢুকে রয়েছে তার মনের এই ভয়টাই গোটা পৃথিবীর মানুষকে সত্য আচার আচরণ করতে বাধ্য করে চলেছে। পুলিশ দিয়ে গোটাকতক ক্রিমিনালকে মাত্র নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কিন্তু কোটি কোটি মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে সেই ভয়টাই। ঈশ্বরের ভয়, ধর্মের ভয়, সেই ভয়টার জন্যেই প্রাচীন সব সংস্কার আজও টীকে আছে। আজকে যদি অরুনাভকে বছরের পর বছর ধরে প্রচার

করা হয় যে তিনি এক এবং অদ্বিতীয়, পরম শক্তিধর, জগতের নিয়ন্তা, ইত্যাদি তাহলে মোটামুটি ৫০০ বছর পর থেকে অরুনাভ-র প্রতিমা গড়ে কমপক্ষে ভারতে পূজা করা হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এভাবেই বিভিন্ন বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন বিশ্বাসের মধ্যে কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, যে স্তরে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যেসব গভীর কথাবার্তা তাঁরা বলেছেন, তা কিন্তু আজও সব দেশের সব ধরনের মানুষের জীবনে, সমাজে প্রাসঙ্গিক। তাই তাঁদের বক্তব্য আজও মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে, মানুষও তাঁদের কথায় আস্থা রাখে, অসহায় মুহূর্তে তাদের কাছেই আশ্রয় খোঁজে। ওই স্তরে নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা এখনকার দিনে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই কোনো নতুন বিষয় হাজার হাজার বছর টিকে থাকবে, একথা বলাও যাচ্ছে না। এখনকার দিনে কেউ নেতার প্রতি তেমন আস্থা রাখতে পারেন না যে, ও যখন বলছে, তখন আমাকে সেটা করতেই হবে। যদি না করি তাহলে আমার এই সমস্যা হবে। প্রকৃত অর্থে সাসটেইনবিলিটি আসতে হলে নেতৃত্বকে এই যীশু বুদ্ধের লেভেলে যোগ্যতা দেখাতে হবে। সেটা এখন প্রচণ্ড কঠিন। মানুষের চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য নেই। যীশুও দরিদ্র মানুষকেই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। দুর্যোধনও যুধিষ্ঠিরকে সূচের ডগায় যেটুকু মাটি, সেটুকু দিতে অস্বীকার করেছিলেন। তারপরেও শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্য সাসটেইন করেছে। যুধিষ্ঠিরের সত্যবাদীতা ইত্যাদি ভারতকে আজও নিয়ন্ত্রণ করছে। কিন্তু সেইসব জীবনের গভীর উপলব্ধি, গভীর সত্যগুলি আজকের কোনো নেতাই নিজেরাও মেনে চলেন না, অন্যদের প্রতিও তাদের সেরকম নির্দেশ দেবার সেইজন্যে ক্ষমতা নেই। সেরকম গভীর উপলব্ধি কোথায়? সবাই নিজেদের তাৎক্ষণিক লাভের হিসেব করে কথা বলেন। সাসটেইনেবিলিটি সেইজন্যে তাৎক্ষণিক। দশ পনেরো বিশ বছরের বিষয়। সেরকম নেতৃত্বকেও কিন্তু সেইসব মহান নেতাদেরও সমসাময়িক কালের মানুষ গ্রহণ করেনি। যীশুকে করেনি। বুদ্ধ কয়েকটি ক্ষুদ্র অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিলেন। আজও কোনো নেতা সেরকম গভীরতার পরিচয় যদি দিতে পারেন, সমসাময়িক কালে না হলেও পরবর্তীকালে নিশ্চই গ্রহণ করবে। এবং লংটার্ম সানটেইনোবিলিটি ঘটবে। কিন্তু ওই স্তরের গভীর উপলব্ধি নেতাদের আজকাল নেই বলেই এত ডাইভার্সিটি। এত নেতৃত্বের পরিবর্তন, হানাহানি চলছে। নেতৃত্বকে মানার ক্ষেত্রেও মানুষের বিচার বিশ্লেষণ থাকবে। বুদ্ধ, চৈতন্য এমনকি অনুকুলঠাকুরও শতবর্ষ পেরিয়ে অনেক মানুষের মনের মধ্যে রয়েছেন। ওই অনুকুল ঠাকুরের মতও আরেকজন তৈরি হওয়া শক্ত হচ্ছে। হাজার হাজার বছর আগেকার নেতাদের নাম ছেড়েই দিচ্ছি। সেই গভীরতা, সেই উপলব্ধি আজকের মানুষের নেই। সবই তাৎক্ষণিকতায় ভর্তি। এখনকার নেতাদের ধৈর্যও নেই। মুখের ভাষারও সংযম নেই। নিজেকে জাহির করার জন্য হাঁক ডাক করে যা বলে, সবটাই নিজের লাভ এবং ভোগের জন্য। এরা নেতা নয়। অন্য কিছু নাম দেয়া যায়। সবার আগে ভাষার সংযম চাই। আর কাজে মিল থাকতে হয়। সেসব হারিয়ে গেছে। □

উন্নয়ন পত্রিকার গ্রাহক হবার নিয়ম সহ অন্যান্য নিয়ম

উন্নয়ন পত্রিকা বছরে চারবার প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক সংখ্যার পৃষ্ঠা সংখ্যা অনুসারে এর উৎপাদন খরচ ওঠানামা করে। কিন্তু এক বছরে নিয়মিত গ্রাহককে চারটি সংখ্যার জন্য ডাকযোগে বাড়িতে এটি পেতে হলে ডাক খরচ সহ মোট দুইশত টাকা দান হিসেবে দিতে হবে। এই টাকাটা সবুজ সংঘের এ্যাকাউন্টে ব্যাঙ্কে ট্রান্সফার করে বা ডাকযোগে চেক পাঠিয়ে দিতে পারেন।

Standard Chartered Bank Kolkata
Account No. : 32111012949
SWIFT Code : SCBLINBBXXX
IFSC Code : SCBL0036087

পত্রিকার চিঠিপত্র পাঠাতে হলে হাতে লিখে ডাক যোগে, ই-মেল করে বা হোয়াট্স্ এ্যাপ করে পাঠাতে পারেন।

পরবর্তী সংখ্যার বিষয় হচ্ছে 'ইন্টগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট'। এই বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে পাঠাতে পারেন যে কেউ। লেখাগুলি সম্পাদনা করার অধিকার সবুজ সংঘের। আপনার লেখা ছাপার জন্যে নির্বাচিত হবে যদি বিষয়বস্তু পর্যালোচনার গভীরতা থাকে। লেখার সঙ্গে আপনার পুরো নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর লিখতে ভুলবেন না।

স্বর্ণলতা সবুজ সেবাসদন

কমিউনিটির মালিকানায় এবং কমিউনিটি দ্বারা পরিচালিত একমাত্র স্বাস্থ্যকেন্দ্র, এখানে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহণ করা হয়।

চব্বিশ ঘন্টা ওপিডি, কুড়িটি ইনডোর বেড, প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি অপারেশন থিয়েটার, ফার্মেসী, ছানি অপারেশনের বিশেষ ব্যবস্থা আছে

গ্রাম এবং পোস্ট : নন্দকুমারপুর
জেলা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন : ৭৪৩৩৪৯
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন ঃ ৭০৬৩৬৭০০৭৬

উন্নয়ন ঃ দ্বিতীয় সংকলন, অগাস্ট-অক্টোবর, ২০২৩
সবুজ সংঘ

রেজিস্ট্রিকৃত কার্য্যালয় ঃ
গ্রাম এবং পোস্ট : নন্দকুমারপুর, থানা:
রায়দিঘী, জেলা: দক্ষিণ ২৪ পরগনা
পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪৩৩৪৯

প্রশাসনিক কার্যালয়
৩০/৯ রাজডাঙা মেইন রোড (পূর্ব)
পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা : ৭০০১০৭
ফোন : (০৩৩) ৪০৭২৩৫৭৭

অন্যান্য কার্যালয়

আলোর দিশা
গ্রাম এবং পোস্ট : চম্পাহাটি
থানা: বারুইপুর, জেলা :দক্ষিণ ২৪ পরগনা
পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪৩৩৩০
ফোন : ০৩২১-৮২৬১১৪৩

সবুজ সংঘ গঙ্গাসাগর
গ্রাম এবং পোস্ট : রুদ্রনগর
থানা : সাগর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা
পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪৩৩৭৩
ফোন : ৯৭৩৫২০৮০৩৩

সবুজ সংঘ- নদীয়া
বিলাল হুসেন মণ্ডল
গ্রাম এবং পোস্ট : নরপতিপাড়া
থানা : চাকদহ, ব্লক : কল্যাণী,
জেলা : নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ
পিন :৭৪১২৪৮
ফোন : ৯৮৭৪৩৮২৫৭৮

সবুজ সংঘ -পাথরপ্রতিমা
গ্রাম পোস্ট : হেরম্বগোপালপুর
থানা : পাথরপ্রতিমা,
জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা
পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪৩৩৮৩
ফোন : ৮১১৬৫৫৬৮১৩

সবুজ সংঘ- মুর্শিদাবাদ
এম, ডি. ভবন, প্রান্তিক পাড়া, পঞ্চাননতলা,
পোস্ট : চালতিয়া, বহরমপুর,
জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২৪০৭
ফোন : ৯৮৫১০৪৪৪৩২

সবুজ সংঘ - আলিপুরদুয়ার
দীপ্তিরঞ্জন দাস, মধ্যপাড়া,
ওয়ার্ড নং ৪, আলিপুরদুয়ার
জেলা : আলিপুরদুয়ার
পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৩৬১২১
ফোন : ৮৩৪৮৫৮৭৫০১

ওয়েবসাইট : www.sabujsangha.org
টুইটার : twitter.com/sabujsangha1
ফেইসবুক : facebook.com/sabujsangha.NGO
ইনস্টাগ্রাম : instagram.com/sabujsangha
ইউটিউব : youtube.com/user/director2431

সবুজ সংঘ, ৩০/৯ রাজডাঙা মেইন রোড (পূর্ব), কলকাতা : ৭০০১০৭, পশ্চিমবঙ্গ, থেকে শ্রী অংশুমান দাস দ্বারা প্রকাশিত এবং ড: দীপংকর রায় দ্বারা সম্পাদিত ও সহযাত্রী, ৮, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯ দ্বারা মুদ্রিত।